ধর্ম্ম-শিক্ষা

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

বর্তমান ইন্টারনেট সংস্করণ :
বিজয়া দশমী, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই "ধর্ম্ম-শিক্ষা" গ্রন্থ সেই উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা "আর্ষপ্রয়োগ" হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত "আর্ষপ্রয়োগ" আর কোন্‌টা বা "প্রেসের ভূত"। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় "প্রকাশকের নিবেদন" বলে প্রকাশ করেছি। "প্রকাশকের নিবেদন" বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্বামীজী এই গ্রন্থ আনুমানিক ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ধর্মবিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ শিক্ষাদানের জন্য লেখেন। বর্তমান সমাজে ধর্মবিষয়ে আমাদের সাধারণ জ্ঞান অত্যল্প। তাই যে কোন মানুষই এই গ্রন্থ অধ্যয়নে অশেষ উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। মূল প্রথম সংস্করণ আজ দুষ্প্রাপ্য। তাই গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণই (প্রকাশকাল - বঙ্গাব্দ ১৩৮১ ইং ১৯৭৪ সন) আমাদের এই সংস্করণের

ভিত্তি। সেই সময় অতি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এই বই প্রকাশিত হয়, তাই স্বামীজীর মূল রচনার সামান্য কিছু অঙ্গচ্ছেদ বা বিকৃতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভবিষ্যতে মূল সংস্করণ যদি আমাদের হাতে আসে তবে আমরা সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস করব।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

পাঠকগণের প্রতি

ধর্ম্মশিক্ষা পুস্তক খানা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হিন্দু মাত্রই উপকৃত হইবেন। বহুদিন ধরিয়া আমাদের শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা অঙ্গীভূত না থাকিবার দরুণ আমরা নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতেছি। বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে আমরা উহার জবাব দেওয়ার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। বহুদিন ধর্ম্মের আলোচনা না থাকিবার দরুণ ধর্ম্মের কোন বিজ্ঞানই আমরা আর বলিতে সক্ষম নহি। হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বিজ্ঞান ও দার্শনিক দিক সকলেরই জানা প্রয়োজন। ইহার কর্ম্ম বিজ্ঞান, উপাসনা বিজ্ঞান ও দার্শনিকতা সবই যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রহস্য উদ্‌ঘাটন সহ এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কাজেই ইহা হিন্দুমাত্রেরই ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিবে। অহিন্দুরাও এই পুস্তক পাঠে ইহা ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিবেন যে মানুষের কর্ম্ম ধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম ও জ্ঞানধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। এবং বিশ্বাসবাদ ধর্ম্মকে ধর্ম্মই বলা চলে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর বা বয়সের বালক বালিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ না লিখিয়া একই গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। মানব জীবনের মধ্যে সংস্কার এবং শিক্ষা এক অপূর্ব্ব বস্তু। সংস্কার দ্বারাই মানুষ বর্ব্বর, পশু ও অসুর হয় এবং সংস্কারই মানুষকে শক্তিশালী দেবত্ব দান করে এবং দুর্ব্বল সংস্কার দ্বারা মানুষের মনোবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দু জাতিকে হিন্দুত্বের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার একটা সংস্কার ধারা মাত্র। বিভিন্ন বয়সের ভাষাজ্ঞানের নকল করিলে কোন সংস্কারই সম্ভব হইবে না। বরং পুস্তকের ভার বহন করানো হইবে। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যার্থীদিগকে প্রথমেই নিত্যকার উপাসনা বিধিতে প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে। ইহা যাহাতে নিত্য অনুষ্ঠিত হয় সে জন্য বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিক্ষক প্রভৃতিকে সচেষ্ট হইতে হইবে। পরে ধীরে ধীরে সব রহস্য বলিতে হইবে। প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত একই পুস্তক পাঠ্য হইবার দরুণ আলোচনা দ্বারাই ধর্ম্মের সব রহস্য সব বয়সের বিদ্যার্থীদের আয়ত্তে আসিয়া যাইবে এবং হিন্দু সমাজের সব শাখাতে নিজেদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সমাজ ও ধর্ম্মজীবন একটা সুনির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শক্তিশালী ভিত্তি লইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলী, টোল, শিক্ষক, অভিভাবক, মঠধারী ও সাধু সন্ন্যাসী সকলকে ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা সমাজকে শক্তিশালী সংস্কারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সমাজধর্ম্ম ও কর্ম্মব্যবস্থাই কর্ম্মধর্ম্ম। এই অধ্যায়ে সমাজ ধর্ম্মের কি ভাবে প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং আজ কাল ইহার রূপ কিরূপ হইয়াছে, ইহার সংশোধন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। আবশ্যক বিরোধিতা নিরসনের জন্য সব স্থানেই বেদ হইতে বেশীর ভাগ প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন হিন্দুদের সমাজধর্ম্ম অত্যন্ত শক্তিশালী । উহা ভুলিয়াই আমরা পদানত হইয়া গিয়াছি।

উপাসনা ধর্ম্ম অংশে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও উহার শাখা প্রশাখায় আরও সব প্রকারের উপাসনাবিজ্ঞান আলোচনা করা হইয়াছে। এই সব শাখা প্রশাখা কিরূপে বিদ্যমান উহাও দেখানো

হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, অবতার, দেবতা, পিতৃ, মহাপুরুষ, প্রেত উপাসনাগুলি কিভাবে একই ব্রহ্মোপাসনার শাখা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। নারায়ণ শিলা, শিব মূর্ত্তি, কৃপাণ, শীতলা, হনুমান প্রভৃতি মূর্ত্তির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট করা হইয়াছে। বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ও বৈজ্ঞানিক চিত্রদ্বারা শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন করা হইয়াছে। নিত্য উপাসনা স্তোত্র, কয়েকটি সগুণ ব্রহ্মস্তুতি, অভয় সূক্ত, বেদের মহামন্ত্র, উপনিষদের জ্ঞান অংশের উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি সকলেরই আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। মহাপুরুষ উপাসনা অংশে বহু পূজনীয়া নারীর জীবন চরিত্র এমন ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে উহাদ্বারা প্রত্যেক চরিত্রের উপর এক একপ্রকার মহান প্রেরণা প্রতিষ্ঠা করিবে। এই অধ্যায়ে জীবন চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজ ও জাতি গঠনের প্রেরণা এবং ব্রহ্মজ্ঞান রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। ইহা ছোট ছোট বালক বালিকাদের চরিত্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিবে। জ্ঞানধর্ম্ম অংশে উপনিষদের জ্ঞান, দার্শনিক জ্ঞান, যোগ নির্দিষ্ট গ্রন্থিভেদ জ্ঞান, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান, বিশেষভাবে সমন্বয় করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ যুক্তিবাদিতার ধর্ম্ম এই অধ্যায়ে এবং সমস্ত গ্রন্থেই উহার দিক দর্শনের ত্রুটি করা হয় নাই। হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের দার্শনিকতায় কি ভেদ উহা ই পুস্তকের অনেক স্থানে দেখান হইয়াছে। জ্ঞানধর্ম্ম অধ্যায়ে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা বালক, বৃদ্ধ ও প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর জানা প্রয়োজন।

গ্রন্থের শেষে 'স্বাস্থ্য ধর্ম্ম' নামক একটি সুন্দর অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সমবেত ব্যায়াম করিবার জন্য সংস্কৃত শব্দসম্বলিত কুচ্‌কাওয়াজ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সহজসাধ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেকগুলি ব্যায়াম ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যাহা নরনারী মাত্রই চিরজীবন অনুষ্ঠান করিয়া সুস্থ থাকিতে পারিবেন।

গ্রন্থের শেষ ভাগে সামবেদীয় সন্ধ্যোপাসনা দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আবশ্যক টীকা টীপ্পনী ও সহজে শান্তিপ্রদ যোগ বিধানগুলি আলোচনা না করিলে এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য কমিয়া যায় এবং গ্রন্থের আকারের বৃদ্ধি অশোভন মনে করিয়া আমরা সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি।

গ্রন্থে পৌরোহিত্য বাদ এবং ব্রাহ্মণ্য বাদের কথা আসিয়াছে। সেই সব কথা স্পষ্ট করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (মজুর) কর্ম্মের ভাগ অনুসারে শাস্ত্রে চার বর্ণের কথা আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ভারতের অনেক স্থান হইতেই চার বর্ণের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বঙ্গদেশ। এখানে চার বর্ণ নাই। যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ আমাদের সমাজে ব্রহ্মণ্য বাদ ও পৌরোহিত্য বাদের প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষত্রিয়গণ শক্তিবাদ (পুরুষোত্তম বাদ) ও আসুরিকবাদ স্থাপনা করেন। বৈশ্য হইতে সমাজপালন ও শোষণবাদ (রাক্ষসবাদ) আসিয়াছে। শূদ্র হইতে কর্ত্তৃত্বহীন কর্ম্মবাদ এবং তামসিকতা আসিয়াছে। সকলে সমান এবং সকলের মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান ইহা ব্রহ্মণ্যবাদ। সমাজের অংশ বিশেষ ও তাহাদের বংশ শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা ভিন্ন সমাজের অন্যান্য অংশ ও তাহাদের বংশ নিকৃষ্ট; দেবালয়ে, তীর্থে, মন্ত্রে, শাস্ত্রে ইহারাই ঈশ্বরের ঠিকেদার এবং অন্যান্য অংশ চাকর বাকর এইরূপ মতবাদই পৌরোহিত্য বাদ। ব্রহ্মণ্য বাদকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার পক্ষে রাক্ষস ও অসুররা অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রু। ইহাদিগকে দমনে রাখিয়া সমাজের সমস্ত অঙ্গের বিকাশনীতি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার কর্ম্ম নীতিই শক্তিবাদ ও পুরুষোত্তমবাদ। পৌরোহিত্যবাদ, আসুরিকবাদ, শোষণবাদ ও তামসিকতাকে বহিষ্কার করিতে হইবে; ইহাই পুরুষোত্তমবাদ। পৌরোহিত্য বাদ যে দেশে যত বৃদ্ধি হইবে সেই দেশে দিনের পর দিন শূদ্রের সংখ্যা ও তামসিকতা বৃদ্ধি হইবে। তামসিকগণকে হাজার জুতা মার অপমান কর, না হুস্ না হাওয়াস। নিজেরা নিত্য উপাসনা করিবে। মঠে, মন্দিরে, দেবালয়ে নিজেরা ব্রহ্মস্তুতি বা সগুণ ব্রহ্মস্তুতি পাঠ করিয়া জল, ফুল, দীপাদি ও প্রণাম নিবেদন করিবে। ফলে পৌরোহিত্য বাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

একদল মূর্খ সর্ব্বত্র গজাইয়াছে যাহারা হিন্দু ধর্ম্মকে অহিন্দু ধর্ম্মের মত বিশ্বাসবাদ বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়। তাহাদিগকে আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, চিরজীবনই ধর্ম্মানুষ্ঠানকে জীবনের পবিত্রতম ব্রত বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন, বলাবাহুল্য এই পৃথিবীতে ইঁহারাই লাভবান। ধর্ম্মানুষ্ঠান সিদ্ধ হইলে উহা দ্বারা শক্তি, সুখ ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় । উহা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে এই শরীরে আংশিক সুখ, আংশিক শান্তি ও আংশিক জ্ঞান ও পরকালে সুখ হয় এবং জন্মান্তরে এই পৃথিবীতে ধনী, সুখী ও কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন হইবার ভাগ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান মানুষকে কেবলই আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে না, উহা মানুষকে লৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মাচরণের অভাবে বা মূর্খ ও বর্ব্বর ধর্ম্মের অনুশীলনের ফলে মানুষ অঙ্গহীন, ঐশ্বর্য্য হীন, প্রতিষ্ঠা হীন, যশ হীন ও ভাগ্য হীন হইয়া জন্ম লয়। এই সম্বন্ধে বেদ ও গীতার আদেশ দেখুন।

প্রাপ্য পুণ্য কৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৬-৪১

যাঁহারা যোগভ্রষ্ট হন তাঁহারা পুণ্য লোক প্রাপ্ত হন, এবং সেইখানে বহু বহু যুগ সুখে অতিবাহিত করেন, তাঁহারা শুদ্ধ বংশে এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন॥

ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ ।

ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরাত্বায় কল্পতে॥ কঠ ১১৩

এই দেহেই যদি কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন এবং জানেন, শরীরপাতের পূর্ব্বেই সেই লোক সকল সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। আর যিনি বুঝিতে অশক্ত হন তিনি উহার ফলে স্বর্গাদি সুখস্থানে শরীর লাভের অধিকারী হন॥

ইতি-

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়	অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক
ধর্ম্ম কাহাকে বলে	
সমাজ জীবনের পূর্ণতাই ধর্ম্ম	
অহিন্দু ধর্ম্ম ও বিশ্বাসবাদ	
হিন্দুধর্ম্মের শাখা	
হিন্দুধর্ম্মে কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান	
কর্ম্ম ধর্ম্ম	
সমাজকে শক্ত রাখাই কর্ম্ম ধর্ম্ম	
বর্ণ বিদ্বেষই শক্তিহীনতা	
হিন্দুধর্ম্ম যুক্তিবাদমূলক	
দর্শন ও যুক্তিবাদের উৎকর্ষ	
বিশ্বাসবাদ	
বেদ জ্ঞান ও ঋষি	
দার্শনিকতা ও যোগানুষ্ঠান	
মনু, বর্ণভেদ ও পৌরোহিত্যবাদ	
ইংরেজ, সাম্প্রদায়িক ঘুষ ও পৌরোহিত্যবাদে সমাজের ক্ষতি	
পৌরোহিত্যবাদিতা ও ভাববাদিতার ফল	
বেদে সর্ব্ববর্ণে প্রেমের আদেশ	
বেদে সর্ব্ববর্ণে অধিকার আদেশ	
ভাববাদীরা বেদের আদেশ অমান্যকারী	
বীরত্ব, নির্ভীকতা ও বৈদিক ধর্ম্ম	
বেদে চারি বর্ণে সমব্যবহার আদেশ	
গীতায় ও বেদে কর্ম্ম, উপাসনা জ্ঞান সম্বন্ধে একই নীতি	
কর্ম্মভেদ, চারবর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম	
শূদ্র শব্দের অপব্যবহার ও গালি	
অসুরের সঙ্গে ব্যবহার	
গুরুজনে ও আত্মীয়ে কর্ত্তব্য	
শিষ্টাচার ও নিত্যনিয়ম ধর্ম্ম	
ওঁ নমস্তে ওঁ নমস্কার	
চার আশ্রম	
দশবিধ বৈদিক সংস্কার	
জ্ঞান লাভের জন্য বহু দীক্ষা	
হিন্দুদের ভাববাদিতা ও ভণ্ডামী	
বেদে স্বরাজের শক্ত আদেশ	
উপাসনা (নিত্য ও নৈমিত্তিক)	
নির্গুণ ব্রহ্মলক্ষ্যে ৭ প্রকার উপাসনা	
উপাসনায় শরীর ও মনের পুষ্টি	
ত্রিসন্ধ্যোপাসনা ও পাঁচ সন্ধ্যা	
সংক্ষেপ সন্ধ্যার ক্রম; প্রাণায়াম	
মহাব্যহৃতি ও ব্যাখ্যা	
গায়ত্রী ও ব্যাখ্যা	
ব্রহ্মস্তোত্র ও ব্যাখ্যা	
অতি সংক্ষেপে সন্ধ্যোপাসনা	
মহাব্যাহৃতির কথা	
মহাব্যাহৃতি, বেদ, গীতা ও কৃষ্ণ	
ব্রহ্মনাড়ী চিত্র	
উপনয়নে অজ্ঞানমূলক শিক্ষা অন্যায়	
আসুরিকতা, বর্ব্বরতা ও পৌরোহিত্য নীতি	
সগুণব্রহ্ম, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। মনোবিকাশের স্তর	
সন্ধ্যোপাসনা ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনার লক্ষ্য একই	
মস্তিষ্ককেন্দ্র চিত্র	
সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতির দৃষ্টান্ত	
মূর্ত্তিবিজ্ঞান, নারায়ণ শিলা	
মূর্ত্তিগুলি ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার সঙ্কেত	
সরস্বতীপূজা ও ছাত্রদের কর্ত্তব্য	

বিষয় অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক

পুরোহিতের ফাঁকি পূজা
নারায়ণ শিলায় সমাজ প্রেম
দুর্ব্বল ও দাম্ভিক নেতা ও রাজা
নারায়ণ শিলা ও ছুঁৎ মার্গ
শিব মূর্ত্তি; মস্তিষ্ক মনস্তত্ত্ব, ষট্‌চক্র মর্ম্মকেন্দ্র, শিব ও শরীরস্থিত আত্মজগৎ
মস্তিষ্কে শিবপিণ্ড, মন, বুদ্ধি কেন্দ্র, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও প্রাণ মস্তিষ্ক
আজ্ঞাচক্র, দ্বিদল, শিবপিণ্ড, মস্তিষ্ক। শিবপিণ্ডধ্যানে নীরোগ শরীর
বৃহৎ মস্তিষ্ক, আজ্ঞা, সহস্রার, শিবমূর্ত্তির সর্পফণা, ব্রহ্মনাড়ী
শিবের পীনেট ও আজ্ঞাচক্র
শিবের পীনেট ও উত্তর দিক
শিবমূর্ত্তি, মিথ্যা প্রচার, ‘হরেকৃষ্ণ’ মন্ত্র ও আত্ম উপাসনা
শিবমূর্ত্তি, আজ্ঞা, বীজ, অঙ্কুরচিত্র
মস্তিষ্কে আজ্ঞা সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র
আজ্ঞা, সহস্রার, শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধ চিত্র
লিঙ্গমূর্ত্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ
লিঙ্গমূর্ত্তি, খৃষ্টান মন্দির এবং কাবার মন্দির; হিন্দু ও অহিন্দু ধর্ম্মে দার্শনিকতা
কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানধর্ম্ম; তিন ব্যাপারেই খৃষ্টবাদী ও মুসলমানগণ বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে
মূর্খ পাদরীদের মূর্ত্তিখণ্ডন ও উহার যথাযোগ্য জবাব
সগুণ ব্রহ্মস্তুতিসম্বন্ধীয় শ্লোক
অবতার উপাসনা
অবতার ও ভ্রান্ত ধারণা
১ হইতে ১৬ কলার জীবভেদ ও চরিত্র ভেদ
অবতার কলা; রাম, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, লেনিনে কর্ম্ম বিকাশের ভেদ। ভাববাদীদিগকে অবতার বলা অন্যায়

বিষয় অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক

শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরাম
শ্রীবুদ্ধ
বুদ্ধগয়ার মন্দির ও হিন্দুদের উপর নেতাদের অবিচার
রাম, বুদ্ধ ও কৃষ্ণ এবং হিন্দুসমাজে ইঁহাদের প্রভাব
ব্রহ্মনাড়ী ও অবতার
মহাপুরুষের উপাসনা
স্বয়ম্ভূব মনু, ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম, আসুরিক সমাজ ও উহাদের অল্পায়ু
সপ্ত ঋষি, আদি পিতা
চার বর্ণ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা খণ্ডন
অনুন্নতরা কে?
ব্যাসদেব। জৈমিনী। গৌতম। কণাদ। কপিল। পতঞ্জলী। পাণিনি। যাজ্ঞবল্ক্য।
সিদ্ধ নাগার্জ্জুন। হরিশ্চন্দ্র।
ধর্ম্মের কীর্ত্তি ও বর্ব্বর কীর্ত্তি
মহাবীর হনুমান, সাগর ডিঙ্গানো
মহারাজ শিবি, রাজার অবিচারে প্রজার অবশ্য পতন
মহারাজ যযাতি
ভীষ্ম। কর্ণ। অনুন্নত হিন্দু। অর্জ্জুন। পাশুপৎ, এটম্ বম্ব, গুরুগোবিন্দ। অনুন্নত হিন্দু। প্রতাপ সিংহ। শিবাজী।
স্বামী দয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ
সতী (দ্রৌপদী, রাজস্থান নারী)
ব্রহ্মজ্ঞান রহস্য ও বেদের কথা
গার্গী (বাঙু) রাধিকা
শবরী
দেবতা উপাসনা (আসুরিকতা ও দৈবী সম্পদ)
অভয় সূক্ত
অহিংসা ও প্রেম
শান্তি। তেজ

বিষয় অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ
সূর্য্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, হিমালয় ও দেবতা
নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম দেবতা
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক
ওঁ, ব্রহ্মনাড়ী, দেবতা উপাসনা
পিতৃ উপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা
ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষ্যে সব উপাসনা প্রয়োজনীয় শাখা ও প্রশাখা মাত্র
আল্লাহ্ ও গড্ উপাসনার সঙ্গে আর্য্য উপাস্যের কোন মিল নাই
শরীর শুদ্ধি ও পিতৃ উপাসনা
ভাবশুদ্ধি ও দেব উপাসনা
নীতিশুদ্ধি ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা
আত্মশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান
প্রেত উপাসনা, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন স্তরের আত্মারা
মূর্ত্তি দর্শন ও প্রেতজগৎ
শীতলা পূজা রহস্য
অস্ত্র প্রতীক কৃপাণ (বলিদান ও কৃপাণ পূজা)
অগ্নি, জল ও ব্রহ্মনাড়ী
জ্ঞান ধর্ম্ম (জ্ঞান কি)
জ্ঞান = অনুভূতি, যুক্তি, বেদ
গ্রন্থি ভেদ জ্ঞানই আসল জ্ঞান
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র গ্রন্থি
মর্ম্ম রহস্য ও মর্ম্মভেদ জ্ঞান

বিষয় অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান
দার্শনিক জ্ঞান। (ষট্ দর্শন)
সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্রের মোটামুটী জ্ঞান
মহামন্ত্র জ্ঞান
সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান
নির্গুণ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান স্তর
সৃষ্টির দৈবস্তর
সৃষ্টির স্থূল স্তর
উপনিষদের জ্ঞান
ধর্ম্ম গ্রন্থ
বেদ, চতুর্ব্বেদ, ত্রয়ী, শ্রুতি
স্মৃতি ও বেদ
সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ
ষড়ঙ্গবেদ। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ।
উপবেদ।
স্মৃতি পুরাণ, মহাভারত, তন্ত্র শাস্ত্র
যোগশাস্ত্র
রুদ্রী, গীতা, চণ্ডী
স্বাস্থ্য ধর্ম্ম। হিন্দুদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা
ব্যায়ামের নিয়মানুবর্ত্তিতা কুচ্কাওয়াজ
ব্যায়াম বিধি
বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনার কথা

ওঁ ষট্ শ্রীমদ গুরবে নমঃ।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে

তোমরা নদী দেখিয়াছ। সমুদ্রের দিকে ইহা প্রবাহিত হইয়া শেষকালে সমুদ্রে যাইয়া মিলিয়াছে। সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হওয়া নদীর ধর্ম্ম। এইরূপ মানুষ ক্রমশঃ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ণতা লাভই মানবের ধর্ম্ম। তোমরা জান, সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া পাহাড়ে ও দেশের সর্বত্র গমন করে এবং বর্ষারূপে সেই জল পৃথিবীতে পতিত হইয়া পরে নদীরূপে সমুদ্রে যায়। ঠিক এইরূপ জীবের উৎপত্তিও ব্রহ্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব ও জগতের উৎপত্তি ও লয়ের এই নিয়মকে ধর্ম্ম জানিবে। এই নিয়মকে জানিতে না পারিলে আমাদের শান্তি এবং তৃপ্তি হয় না। এই নিয়মকে জানিবার জন্য পৃথিবীতে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নাম হিন্দু ধর্ম্ম। এই নিয়মকে জানিবার জন্য কত শত যোগী ঋষি ও মহাত্মা আমাদের এই হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। এখনও হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য যোগী ও তপস্বীর অভাব নাই। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মেই এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার কোনই বিধান আবিষ্কার হয় নাই।

মানুষের সমাজ-ধর্ম্ম, রাষ্ট্র-ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সাধনা সবই পূর্ণতার পথ খুঁজিতেছে। মানুষের সমস্ত প্রকার নিয়মই পূর্ণতার পথ চায়; মানুষের ইহাই ধর্ম্ম। যতক্ষণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না ততক্ষণ উহার দ্বারা আমাদের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি হয় না। কাজেই তোমরা ধর্ম্ম শিক্ষার মধ্যে পূর্ণতার নিয়ম খুঁজিতে চেষ্টা করিবে।

আজকাল অনেক অহিন্দু ধর্ম্মেরও নাম শুনা যায়। ঐ সব ধর্ম্ম বিশ্বাস বাদ মাত্র। ঐসবে কোন দার্শনিকতা বা যুক্তি নাই। আমাদের দেশেও আধুনিক কালে বিনা প্রয়োজনে অনেক উপধর্ম্ম বা শাখাধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ ঐ ধর্ম্মে সাময়িক বিশ্বাস করে; কিন্তু দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদ লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে একটা দিনও মানুষ ঐ সব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে না বা প্রতিপালন করিলে কোন প্রকারেই জীবন চলে না। আধুনিক যুগে কতগুলি উপধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হইবার দরুণ আমাদের ধর্ম্ম এখন হিন্দুধর্ম্ম নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তোমরা ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে কোথাও হিন্দুধর্ম্ম নামে কোন ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম, গৃহস্থধর্ম্ম, পতিধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্মের নাম পাওয়া যাইবে। আমাদের ধর্ম্ম অর্থে সমাজ জীবনের ও অধ্যাত্ম জীবনের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ নীতি জড়িত শক্তিশালী জীবনকে বুঝাইয়া থাকে।

হিন্দুস্থানে যত প্রকার ধর্ম্মমত উত্থিত হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে সবই হিন্দুধর্ম্ম। নবীন, প্রাচীন, বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, প্রাকৃতিক, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সর্ব্বপ্রকার শাখাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া তোমরা জানিবে। তোমরা ঐ সব বিভিন্ন প্রকার হিন্দু ধর্ম্মের শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে বেদনির্দিষ্ট "ওঁ"এর উপাসনা সব শাখাতেই বিদ্যমান।

হিন্দু ধর্ম্মের তিনটা দিক আছে - (১) কর্ম্ম, (২) উপাসনা, (৩) জ্ঞান। বেদকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মধর্ম্ম, উপাসনাধর্ম্ম ও জ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত জানিবে। বেদের ভিত্তিহীন আধুনিক উপধর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই।

কর্ম্ম-ধর্ম্ম

সমাজ রক্ষায় আমাদের যে স্বাভাবিক কর্ত্তব্য, উহাই কর্ম্ম-ধর্ম্ম। যদি আমরা কর্ম্ম-ধর্ম্ম ঠিকমত পালন করিতে না পারি তবে আমাদের সমাজজীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদি সমাজজীবন নষ্ট হইয়া যায় তবে অধ্যাত্ম জীবন বা ধর্ম্মজীবন অসম্ভব। যে দিন হইতে হিন্দুরা পরাধীন হইয়াছে সেইদিন হইতেই হিন্দুদের সমাজজীবন মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।

কর্ম্মধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতাই আমাদের পতন ও পরাধীন করিয়া দিয়াছে। কর্ম্ম-ধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম ও জ্ঞান ধর্ম্ম একই অধ্যাত্ম বা আত্ম ধর্ম্মের তিনটা বিভিন্ন দিক। এই তিন প্রকার ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য লৌকিক জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং মনোজগতের শান্তি। তিনটি ধর্ম্ম এমন ভাবে জড়িত যে একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটীকে সুন্দর করা যায় না।

আমাদের সমাজজীবনের ভুল ভ্রান্তির জন্য আমরা দুর্ব্বল ও পরাধীন হইয়া গিয়াছি। আমাদের সমাজজীবনের সমস্যা এখন নূতন ভাবেই সমাধা করিতে হইবে। আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও প্রাচীনতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের এই জীবন আবার গড়িয়া লইতে হইবে। সমাজজীবনকে শক্তিশালী করা এবং শক্তিশালী রাখা এবং সমাজ জীবনকে সুখময় করা এবং সুখময় রাখাই আসল সমাজধর্ম্ম। সমাজজীবনকে এইভাবে শক্তিশালী রাখিবার জন্যই সমাজ জীবনের সকলের সহিত সকলের ব্যবহার এবং কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। আমরা যদি সমাজজীবনের আসল লক্ষ্য ভুলিয়া যাই তবে অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও উদ্দেশ্যহীন বা লক্ষ্যহীন হইয়া যাইবে। সমাজ ধর্ম্মের ভিত্তি প্রেম। সমাজ জীবনের পতনের মূলে ঘৃণা ও বিদ্বেষই আমাদের কর্ম্ম ধর্ম্মের ভিত্তি হইয়াছিল। কাজেই কর্ম্মধর্ম্মের যে ইহা পতন ইহা মনে রাখিবে।

ব্রাহ্মণ ভাবিল, আমরা শ্রেষ্ঠ; এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণ নিকৃষ্ট। এইরূপ ক্ষত্রিয় ভাবিল, আমরা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রগণ নিকৃষ্ট। বৈশ্য ভাবিল আমরা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রগণ নিকৃষ্ট। শূদ্র ভাবিল আমরা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ নিকৃষ্ট। একজন যদি অন্যজনকে বিনা কারণে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তবে স্বভাবতঃই অন্য জন তাহাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবেই। তোমরা কিছুদিন বেশ অনুসন্ধিৎসা লইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিচরণ করিলে দেখিতে পাইবে বিনা কারণে প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণীর একটা জন্মগত বিদ্বেষভাব বিদ্যমান। এদিকে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর একই শ্রেণীর বিভিন্ন শাখাতে বিদ্বেষ এমন জঘন্য ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে উহা দেখিলে তোমরা হতাশ হইবে। একটা জাত বিগত ১৫০০ বৎসর যাবৎ ঘৃণিত বিদ্বেষ বাদের অনুশীলন করিবার পর সেই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে না কি? একে ত সমবেতভাবে বৈদিক ধর্ম অনুশীলনের পথ রুদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক শাখা প্রশাখা বিদ্বেষবাদে জর্জ্জরিত; বল এরূপ সমাজ পদানত হইবে না তো কাহারা পদানত হইবে?

হিন্দুদের ধর্ম্মবিধানের মূলে অন্যান্য ধর্ম্মের মত বিশ্বাসবাদের* স্থান নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতা ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া অবস্থিত; যদি তোমরা দার্শনিকতা ও যুক্তিকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পার এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পার তবে হিন্দু ধর্ম্মও বুঝিতে পারিবে।

---

*বিশ্বাসবাদ। যে বস্তুর দার্শনিকতা বা যুক্তি নাই; ভ্রান্তি বশে অথবা গুণ্ডামি করিবার জন্য একটা প্রয়োজনীয় কিছু মানিয়া লওয়ার নাম বিশ্বাসবাদ। আমাদের দেশের সর্বধর্ম্মসমন্বয়বাদও যুক্তিহীন এবং কাল্পনিক বিশ্বাসবাদ মাত্র। আর্য্যজ্ঞানের ঈশ্বরতত্ত্ব এবং গড্ বা অল্লাহ্ একতত্ত্ব নহে। ঈশ্বর ব্যাপক; কিন্তু গড্ বা আল্লাহ্ ব্যক্তি বিশেষ মাত্র।

তবে তোমরা একটা কথা এখানে মনে রাখিবে; যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতা বলিতে তুমি কতটুকু যুক্তি ও দার্শনিকতাকে বুঝিতে পার সেইটুকুই সব নহে। এই যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতাকে সমুচ্চ শিখরে স্থান দিবার জন্য আমাদের দেশে অনেকগুলি দর্শন শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যথা- বেদান্ত, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, বৌদ্ধ দর্শন ইত্যাদি। তোমরা যখন একখানা শাস্ত্র পাঠ করিবে তখন মনে হইবে ইহা নিশ্চয়ই অকাট্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, অন্য দর্শনখানা পাঠকালে দেখিতে পাইবে, যাহা অকাট্য তাহাও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ প্রমাণ বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। একমাত্র বৌদ্ধ দর্শন বেদের প্রমাণ সংগ্রহ করে নাই। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের অনুকূলে বেদ মন্ত্রের মোটেই অভাব নাই। কারণ বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তি সাংখ্য দর্শন এবং উহার লক্ষ্য অদ্বৈতবাদ।

বেদে লৌকিক অলৌকিক সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বা জ্ঞানের সংগ্রহ আছে। ইহা কোন এক ব্যক্তিকৃত জ্ঞান নহে। ইহাতে বহু ঋষি দৃষ্ট মন্ত্র রাশির সংগ্রহ আছে। জ্ঞানের অনেক স্তর আছে। একজন ঋষি যখন যেমন স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তখন সেই স্তরের মন্ত্র বা জ্ঞানগুলি মাত্র দেখিতে বা অনুভব করিতে পারেন। জ্ঞানের স্তর ভেদের জন্যই আমাদের দেশে অনেকগুলি দর্শনশাস্ত্র হইয়াছে।

এত দর্শন শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সাধনা ও যোগবিদ্যা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেহই মতভেদ দেখান নাই। কাজেই তোমরা যোগ অনুশীলন ব্যাপারে ও উপদেশ ব্যাপারে দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিভ্রান্ত হইবে না।

তোমরা মনু স্মৃতির নাম শুনিয়াছ। স্মৃতিশাস্ত্র বলিতে সমাজ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। এই সমাজ ব্যবস্থারও অনেক শাস্ত্র রহিয়াছে। সকলেই বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মানিয়াছেন। আজকাল অনেকে বর্ণ ভেদ প্রথা সমর্থন করেন না। সমর্থন না করিবার কারণও আছে। আমরা বর্ণভেদ সমর্থন করি। কিন্তু অছুতবাদ মানিনা। অছুতবাদ আমাদের ধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে বিরূদ্ধ বস্তু। আমরা জাতিভেদ মানিলেও উপাসনাভেদ সমর্থন করি না। কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক উদার ব্রাহ্মণ্যবাদরূপ স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সমাজে বিদ্বেষবাদ বা পৌরোহিত্যবাদ স্থাপন করিয়াছে। কিছু লোক নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এবং আরও কুৎসিত হীন মনোবৃত্তি ইহাতে প্রক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। যাহারা এই নীচতা মানিয়া লইয়াছে, তাহারা বিশ্বাস বশে এবং অজ্ঞানতা বশে দুর্ব্বল ছিল বলিয়াই মানিয়াছে। যাহারা ইহা প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহারা যে খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা মানিয়া লইয়াছে তাহারা ছিল দুর্ব্বল এবং যাহারা ইহা আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে তাহারা ছিল স্বার্থপর।

আমাদের দেশে যখন ইংরেজরা দুষ্টতা বশতঃ মুসলমানগণকে ঘুষ দিয়া সাম্প্রদায়িক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে তখনও ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটে। স্বার্থবশে একদল মুসলমান উহা আঁক্ড়াইয়া ধরে এবং আরও ঘুষ পাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। দুর্ব্বলতায় জড়িত হইবার দরুণ জাতীয়তাবাদীরা ইহা মানিয়া লয়। দুষ্টতা, স্বার্থ ও দুর্ব্বলতা এইভাবেই একটা জাতকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়। ইংরাজের দুষ্টতা, একদল মুসলমানের স্বার্থপরতা ও জাতীয়তাবাদীদের দুর্ব্বলতার সহিত আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদের সমভাবে তুলনা করা যায়।

আমাদের দেশে উপাসনায় ভেদবাদ স্থাপনার ব্যাপারে অনেক ভাববাদী মহাত্মাও যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন। পৌরোহিত্যবাদীরা ইহাদের আড়ালে থাকিয়া নানা প্রকারেই চাল খেলিয়াছেন। ইহা যথেষ্টই অন্যায় হইয়াছে। উপাসনায় ভেদবাদ আনিবার দরুণ জাতিভেদ প্রথা আমাদের নিকট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। যদি আমরা একটু চেষ্টা করিয়া উপাসনায় ভেদবাদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারি তবে জাতিভেদ প্রথার কথা আমাদের মনেও থাকিবে না। এক যুগের কর্ম্মভেদই এই যুগের জাতিভেদ। দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই। তোমরা সকলেই বৈদিক উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিবে তাহা হইলে পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বেদে কর্ম্মভেদে জাতিভেদের কথা আছে; কিন্তু বিদ্বেষের স্থান কোথাও নাই। বরং প্রেমই বেদের প্রধান ভিত্তি যথা - ওঁ রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজেসু ন স্কৃধি। রুচং বৈশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি, ময়ি ধেহি রুচা

রুচম্॥ (হে পরমাত্মন্) আমাদের অত্যন্ত প্রীতি ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রতি স্থাপনা কর। আমাদের অত্যন্ত প্রীতি যোদ্ধাগণের প্রতি স্থাপনা কর। আমাদের অত্যন্ত প্রীতি হইতেও প্রীতি ব্যাপারী ও মজুরদের প্রতি স্থাপনা কর॥ (যজুর্ব্বেদ অঃ-১৮; মন্ত্র ৪৮॥)

উপাসনার জন্যও বিভিন্ন জাতির জন্য বা বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মী সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধি বেদ বলেন নাই। যথা -

ওঁ যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চর্য্যায় স্বায় চারণায়।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং।
মে কামঃ সমৃধ্যতামুপমাদো নমতু॥

এইরূপ -

আমি (ঈশ্বর) এই বেদবাণী সকল, যাহা অত্যন্ত কল্যাণময়ী, সমস্ত মানুষের জন্য বলিয়াছি (তোমরাও সেইরূপ বল)। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য, শূদ্রদের জন্য, বৈশ্যের জন্য, নিজের স্ত্রী ও চাকরাদির জন্য এবং অতি শূদ্রের জন্য, আমার এই কামনা বৃদ্ধি হউক যে - মূর্খগণকে উপদেশ দেওয়া হউক। যে ইহা (এই জ্ঞান) দান করিবে আমি তাহার প্রিয় হইব। এবং তাহাদের উভয়ের (দাতা ও গ্রহীতা) সমৃদ্ধি ও আত্মকল্যাণ প্রাপ্তি হইবে। (প্রিয়ো দেবানাং = মূর্খ। এ সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র আছে।) যজু অঃ ২৬। মন্ত্র ২॥

তোমরা বেদের এই মহান আদেশ অনুসরণ করিয়া নিজেরা বৈদিক ধর্ম্মানুশীলন করিবে এবং অন্যকেও করাইবে। যে সব মহাত্মাগণ বেদের মহান আদেশ ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের নিজেদের মনের মত ভাববাদ শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহারা নিজেরা বেদের আদেশ অমান্য করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। বেদের মধ্যে সমাজ-ধর্ম্মের সবচেয়ে শক্তিশালী উপদেশই বিদ্যমান। যদি তোমরা সংহিতাভাগ (বেদ) পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবে বীরত্ব, নির্ভীকত্বকে কত জোর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে ও আসুরিক আক্রমণকে ভাঙ্গিয়া দিবার কিরূপ যুক্তি সঙ্গত আদেশে মন্ত্রগুলি ভরপুর।

যেখানেই চারি জাতির মধ্যে ব্যবহারের কোন কথা আসিয়াছে সেইখানেই দেখা যায় বেদ কেবলই সমদৃষ্টির উপর জোর দিতেছেন। কোথাও অসমদৃষ্টির কথা নাই। যথা-

ওঁ তাং মে সহস্রাক্ষোদেবো দক্ষিণ হস্তে আ দধত।
তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্রঃ উতার্য্যঃ॥

তিনি সহস্র অক্ষি পুরুষ (অর্থাৎ অনন্ত ও জ্ঞানময় পুরুষ), তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে স্থাপনা করিয়াছেন (অর্থাৎ আমাকে তিনি তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে কর্ম্মী করিয়াছেন)। তাঁহার জ্ঞানময় দৃষ্টিতে আমি আর্য্য (পণ্ডিত) এবং শূদ্র (অশিক্ষিত) সকলকে দর্শন করি। অথর্ব্ব কাণ্ড ৪, সূক্ত ২০॥

তোমরা যদি গীতা পাঠ কর তবে বেদের কর্ম্ম, বেদের উপাসনা ও বেদের জ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারিবে। গীতাকে একটী ছোট বেদ বলা চলে। গীতার আধুনিক ব্যাখ্যা ও টীকাকারদের মধ্যে শক্তিবাদী বড় কেহ নাই, এজন্য গীতার বাস্তব জীবন সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অন্ধ থাকিয়া যাইতেছি। গীতার টিপ্পনীকারদের মধ্যে ভাববাদী ও পৌরোহিত্যবাদীদের প্রভাব খুব বেশী। তাঁহারা বেদের বাস্তব জীবন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন।

তোমরা যদি দর্শনশাস্ত্র পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবে - সৃষ্টির মূলে এক প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। এই নিয়মের নাম ত্রিগুণ - সত্ত্ব, রজঃ, ও তম। এই তিন গুণের বৈষম্যের জন্যই মানুষের প্রকৃতি একরূপ হয় না। তিন গুণের বৈষম্যেই কর্ম্মেরও ভেদ হইয়াছে। হাজার চেষ্টা কর মানুষের প্রকৃতি, কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি কিছুতেই একরূপ হইবে না। সকলের মন একই কাজের জন্য একরূপে উপযুক্তও হয় না। সমাজ-জীবন ও প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ বৈষম্যে সমাজ প্রস্তুত থাকিবার দরুণ একই কাজ দ্বারা সমাজ নিয়মিত হয় না।

সমাজের মধ্যে কেহ কেহ সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ (ব্রাহ্মণ), কেহ কেহ সত্ত্ব-রাজস প্রকৃতির (ক্ষত্রিয়), কেহ কেহ রজ-তামস প্রকৃতির (বৈশ্য), কেহ কেহ তামস প্রকৃতির (শূদ্র), আবার কেহ কেহ তমঃ প্রধান রাজস প্রকৃতির বা আসুরিক প্রকৃতির মানুষ হইয়া থাকে। যাহার যেমন প্রকৃতি এবং যাহার যেমন কর্ম্মশক্তি সে সমাজ জীবনে সেইরূপ কর্ম্ম বাছিয়া লয়। ক্রমে বংশ পরম্পরাতে যদি একই বৃত্তি বা কর্ম্মের অনুশীলন হইতে থাকে তবে সেই বংশকে সকলেই সেই বৃত্তির বা জাতের লোক বলিবে ইহা স্বাভাবিক। কর্ম্মভেদের জন্যই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যদি তোমরা মানুষের স্বভাব ও কর্ম্মকে বাদ দিয়া বিশুদ্ধভাবে একজনকে দেখ তবে দেখিতে পাইবে সব মানুষই একই আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। এইজন্য সন্ন্যাসীর জাতি নাই।

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাদের জীবন কতকগুলি কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। এই কর্ত্তব্যগুলিই 'কর্ম্ম'। আমাদের শরীরে ও মনে গুণের তারতম্য আছে। এই জন্যই আমাদের স্বভাব ও কর্ম্মভেদ স্বাভাবিক। এই স্বভাবের সঙ্গে জন্মগত বৈশিষ্ট্য যে খুব বেশী সম্বন্ধ রাখে ইহা বলা যায় না।

আমাদের সমাজে জন্মগত কারণে কাহাকেও উচ্চ বা হীন ভাবার কিছুটা ভ্রান্ত শিক্ষার নিয়ম আছে। এই ভ্রান্ত শিক্ষা ভিন্ন জন্মগত বিধানে এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই যে কেহ উচ্চ হইয়া যাইবে বা কেহ নীচ হইয়া যাইবে। তবে বংশগতভাবে আমরা কতকগুলি উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক আচার ব্যবহার এবং বংশগতভাবে আমরা কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া থাকি। যাহাতে সকলের বংশে একই উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, এই জন্য শিক্ষা জীবনেই আমাদিগকে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তোমরা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সমাজশাখাতে উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক আচারধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইবে।

জ্ঞান প্রধান কর্ম্ম, অস্ত্র ধারণ কর্ম্ম, কৃষি ও ব্যাপার এবং মজুরীর কর্ম্ম; কর্ম্মের এই চার প্রকার ভেদ স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের সহিত বংশগত কোনই সম্বন্ধ নাই। এক যুগে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ অস্ত্রধারণ করিলে এই যুগে আমি জ্ঞানের চেষ্টা করিতেছি, বা এক যুগে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ মজুরের কাজ করিলেও এই যুগে আমাদের পিতা ও আমি রণবিদ্যায় দক্ষ হইয়াছি। একই ঋষির চার পুত্র; একজন জ্ঞান প্রধান কর্ম্ম করেন, একজন যোদ্ধা, একজন কৃষক ও একজন মজুর। মজুরের ছেলেটি যদি জ্ঞান প্রধান কর্ম্ম করে তবু তাহাকে মজুর বলা অবৈজ্ঞানিক হইবে না কি? এক যুগে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন, এইযুগে আমি পাচকের কাজ করি, আমি জ্ঞানী কোথায় রহিলাম?

অনেক স্থানে দেখা যায় 'শূদ্র' শব্দ ঠিক গালিগালাজের স্থান অধিকার করিয়াছে। মজুরের কাজ কি সত্যই কোন অপরাধীর কাজ? কোন সুপ্রাচীন যুগে কাহারও পূর্ব্বপুরুষ যদি মজুরের কাজ করিয়া সমাজ সেবা করিয়া থাকে তাহাতে সে এমন কি অন্যায় কাজ করিল যে যুদ্ধ দ্বারা সমাজ সেবকের বংশ হইতে সে নিকৃষ্ট হইয়া যাইবে? একজন লোক কোন চুরি করিল না, অনাচার অত্যাচার করিল না, মিথ্যা বলিল না, তবু সে অপরাধী? এবং তাহার বংশ অপরাধী? তোমরা জানিয়া রাখিও এসব পৌরোহিত্য দস্যুদের কুকাণ্ড। তোমরা এই দস্যুতা ভাঙ্গিয়া দিবে, যাহাতে সব রকম মানুষের জন্য কর্ম্ম বণ্টন ব্যবস্থা থাকে। এইজন্য প্রাচীনকালে রাজশক্তির যথেষ্ট সাবধানতা ছিল। মধ্যযুগে এই সাবধানতায় যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। এইজন্য মধ্যযুগে এই পৃথিবীতে নানাপ্রকারের সমাজ বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এখন রাজশক্তি বা ষ্টেট অনেকস্থলে সেইজন্য যথেষ্ট সাবধান হইয়া উঠিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ। অনেকে উৎপাদনের কারণগুলিকে সবই ষ্টেটের হাতে দিবার পক্ষে। আমরা উহাকে কোন দূরদর্শীনীতি বলিয়া স্বীকার করি না। আমাদের দেশে বৃত্তি-গ্রহণ বংশপরম্পরায় হইতেছিল। ইহাও ভাল নীতি।

আসুরিক লক্ষণ সম্পন্নগণ, চুরি ডাকাতি, গুণ্ডামি, বদমাইসী, নারীহরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি করিয়া সমাজের অনিষ্ট করে। ইহাদের বিরুদ্ধে রাজশক্তি ও সমাজের কঠোর বিধান থাকা প্রয়োজন। ইহাদের জন্য তোমরা অত্যন্ত কঠোর নীতির সমর্থক হইও। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা আদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে ইহাদিগকে

অসুর নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং এই শ্রেণীর উপর কঠোর নীতির সমর্থক হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আসুরিক লক্ষণ ও ঠগ-লক্ষণযুক্ত কোন সমাজকেই ভ্রান্তিবশে নিজেদের পরিজনে মিশিতে দিবে না। ইহাতে সর্ব্বদাই মন্দ ফল হইয়া থাকে।

তোমরা পিতা, মাতা, ভাই, বোন, গুরু, শিক্ষক ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি কর্ত্তব্যশীল হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যেও অবহেলা করিবে না। সকলকে সৎ পরামর্শ দিবে। স্বাস্থ্য রক্ষা ও উপার্জ্জনে নিষ্ঠা রাখিবে। এই সবই কর্ম্মধর্ম্মের অন্তর্গত কথা জানিবে।

আচার ও শিষ্টাচারও কর্ম্মধর্ম্মেরই অঙ্গ জানিবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতগুলি আচার বিধান আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সেইগুলি তোমরা অবশ্যই পালন করিবে। যথা - প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, মলমূত্র ত্যাগ, দাঁতন করা, মুখ-ধোয়া, স্নান, কাপড় কাচা, স্বাবলম্বী হওয়া, ব্যায়াম করা, আহারান্তে মুখ ধোয়া, মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করা, চা আদির অভ্যাস না রাখা, মলমূত্র ও উচ্ছিষ্ট বাসস্থান হইতে দূরে পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। এই পৃথিবীতে হিন্দুদের আহার প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত পবিত্র। উহা পালন করিবে। আহার্য্য বস্তুর নিকটে হাঁচি, কাশি, বা কোন প্রকার নোংরামি করিবে না। আহারে ও পানীয় বস্তুতে উচ্ছিষ্টবিধান মান্য করিবে। ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার অতীব প্রয়োজনীয় নিয়ম। পানান্তে গ্লাস এবং ভোজনান্তে থালা, বাটী ইত্যাদি শুদ্ধ মাটীর দ্বারা মাজিয়া ধুইয়া রাখিবে। একজনের উচ্ছিষ্ট বাসনের খাদ্য ও পানীয় কখনও পান করিবে না। ইহার দ্বারা কঠিন সংক্রামক রোগ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে নীত হয়। মুখের মধ্যে ময়লা হাত প্রবেশ করাইবে না এবং মুখে হাত দিবার পর হাত ধুইবে।

শিষ্টাচারের মধ্যে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা বোঝায়। কাহারও সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা থাকিলে ওঁ নমঃ, ওঁ ভদ্রঃ, ওঁ নমস্কার, ওঁ নমস্তে, বা প্রণাম ইত্যাদি শিষ্টাচার দেখাইয়া আলাপ করা ও উক্ত নিয়মে বিদায় দেওয়ার অভ্যাস রাখিবে। বিশেষ গুরুজনকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইয়া শিষ্টাচার দেখাইবে এবং "ওঁ নমো নমঃ" বলিবে। যখনই প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখনই ঐরূপ শিষ্টাচারের অভ্যাস করিবে। মহাত্মাগণকে "ওঁ নমো নারায়াণায়" বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইবে। মনে রাখিবে শিষ্টাচার প্রদর্শনে কোনই খরচা নাই কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাইয়া থাকি।

সমাজ জীবনের কর্ত্তব্যকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রে আমাদের জীবনকে ১০০ বৎসর মানিয়া লইয়া চার ভাগ করা হইয়াছে। যথা - ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস। প্রত্যেক ভাগে ২৫ বৎসর জানিবে। শিক্ষার জীবনকেই ব্রহ্মচর্য্য জীবন জানিবে। এসময় সংযম অবলম্বন করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য উপার্জ্জন ও সমাজ পালন। বানপ্রস্থকালে নিজের আত্মজ্ঞান লাভ করা ও অন্যকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া, সন্ন্যাস জীবনের অর্থ হইতেছে জ্ঞানময় জীবন। ইহা ভোগ, মোহ ও অহং শূন্য (অনহং) কর্ম্ম ও জ্ঞানময় জীবন। অনেকে ব্রহ্মচর্য্য বা গার্হস্থ্য জীবন হইতেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তোমরা সমস্তটা জীবনই সতেজ থাকিতে চেষ্টা করিবে। দেখিতে পাইবে জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তোমাদের চিন্তাধারা ঠিক ঐ চারটা ধারাতে আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে।

ঋষিগণ আমাদের শিক্ষার জীবন মাতৃগর্ভ হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং কতগুলি আশ্চর্য্য বৈদিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যথা - গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণভেদ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ণ, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ। প্রথম তিনটি সংস্কার মাতৃগর্ভে হইয়া থাকে। পরের তিনটি সংস্কার অত্যন্ত বাল্যকালে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ৫ বৎসরের মধ্যে পরবর্ত্তী তিনটি সংস্কার দিতে হয়। ৫ বৎসরের পর ১৬ বৎসরের মধ্যে উপনয়ন ও বেদারম্ভ সংস্কারের সময়। ইহার পর শিক্ষাকাল শেষ হইলে কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়া পিতামাতার নিকট ফিরিয়া আসাই 'সমাবর্ত্তন'। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের নাম 'বিবাহ' সংস্কার।

সন্ন্যাস জীবনোচিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অনেকগুলি সংস্কার আছে, সেই সংস্কারগুলির নাম ‘দীক্ষা’। দীক্ষার ক্রম আছে, যথা - (১) শাক্ত দীক্ষা, (২) পূর্ণদীক্ষা, (৩) ক্রমদীক্ষা, (৪) সাম্রাজ্য দীক্ষা, (৫) মহা সাম্রাজ্যদীক্ষা, (৬) যোগ দীক্ষা, (৭) মহাপূর্ণ দীক্ষা, (৮) সন্ন্যাস।

কিরূপ ভীষণ কঠোরতার মধ্যে দিয়া হিন্দুরা নিজেদের সমাজ জীবনকে গড়িবার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা এসব সংস্কারগুলির বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারিবে।

এইসব সংস্কারগুলির অতি সামান্যই এখন সমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংস্কার গুলির কিছু অংশ পুরোহিতগণের উপার্জ্জনের জন্য এখনও প্রচলিত আছে। দীক্ষার ধারাগুলি এখন একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এবং ভাববাদী মহাত্মাগণ সস্তায় ভাববাদ ছড়াইয়া সমাজের চিত্তকে এমন দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছেন যে একজন হিন্দুনারী রাস্তা দিয়ে গুণ্ডার ভয়ে একা কোথাও যাইতে সাহস পায় না। দেশের স্বাধীনতা, স্বরাজ, শক্তি সবই ১৫০০ বৎসরের বিস্মৃত স্বপ্নে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। (সংস্কার বিষয়ে শক্তিশালী সমাজ বই দেখ)।

বর্ত্তমান কর্ম্মধর্ম্মের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা দেশের স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীনতাহীন সমাজ বিকাশের অনুকুল হয় না। আবার যাঁহারা আসুরিক ও বর্ব্বরগণকে প্রশ্রয় দিয়া সস্তায় স্বরাজ লাভ করিবার কথা ভাবেন তাঁহাদের নেতৃত্বে বিশ্বাস করা যায় না। প্রায় ১০০০ বৎসর ধরিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি। ইহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বেশ ভালভাবে চেষ্টা হইলে ইহা অনেক পূর্ব্বে উদ্ধার হইয়া যাইত। সমাজ জীবনে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী বিপদ কোন দেশ ভোগ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। জানিয়া রাখিও হিন্দু ধর্ম্ম কোন শক্তিহীন ধর্ম্ম নহে। ভাববাদিতা এবং পৌরোহিত্যবাদিতা আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে এবং পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে সমাজকে গুণ্ডার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহারাজ পৃথ্বীরাজ আসুরিক লক্ষণযুক্ত মহম্মদ ঘোড়ীকে ১৭ বার পরাস্ত করেন এবং ভাববাদিতা বশতঃ ছাড়িয়া দেন। ইহারই ফলে আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীন হইয়া পড়ি। বেদ কর্ম্ম-ধর্ম্মের এই স্বরাজ লাভের অংশকে একটুও ছোট করিয়া দেখেন নাই। এ সম্বন্ধে বহু মন্ত্র বেদে আছে। কিন্তু কোন মন্ত্রেই ভাববাদিতার সমর্থন দেখা যায় না।

একটি মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

যথা - ওঁ প্রহ্যভীতি ধৃষ্ণু হৈ ন তে বজ্রো নিশংযতে।

ইন্দ্র নৃষ্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়ঃ

অপর্চন্নুতু স্বরাজ্যম্॥

হে ইন্দ্র (নেতা) স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য সাধনা করিতে করিতে তুমি অগ্রসর হও। সম্মুখে এসো (অর্থাৎ ভয় পাইও না)। তুমি বাধা অতিক্রম কর। তোমার বজ্র কখনও পরাজিত হয় না। (অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহারে তুমি বিচলিত হইও না)। হে ইন্দ্র (নেতা) তুমি নিশ্চয়ই স্বরাজরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ স্বরাজের চেষ্টা ব্যর্থ হয় না)। তুমি নিজের শক্তি দ্বারা বৃত্ররূপ বাধাকে ধ্বংস কর এবং সর্ব্বকার্য্যে জয় লাভ কর। সামবেদ, ৫ম প্রপাঠক। ৩ দশম॥ মন্ত্র ৪১৩॥

উপাসনা

নিত্য কর্ত্তব্য উপাসনা ও নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য উপাসনা, উপাসনার এই দুই প্রকারের ভেদ আছে। দিন রাত্রের মধ্যে এই পাঁচটি সন্ধি-কাল বাহির করা হইয়াছে। এই পাঁচ সন্ধ্যায় উপাসনার নাম "নিত্য কর্ত্তব্য উপাসনা"। এই পাঁচটির মধ্যে তোমরা যদি তিনটি উপাসনা (সকাল, মধ্যাহ্ন, সায়ং) কর তবে উহা তোমাদের শরীর ও মনের বিশেষ অনুকূল হইবে। যাহারা ইহাতেও অক্ষম তাহারা একটি সন্ধ্যোপাসনা করিবে (প্রাতঃ, সায়ং)। "সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তুরীয়া ও ব্রহ্ম" ব্রহ্ম জ্ঞানের এইরূপ পাঁচটী স্তর আছে। অর্থাৎ এই পাঁচটী স্তরের যথাযথ জ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞান। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, মধ্য রাত্রি ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এই পাঁচটি সময়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানের এই পাঁচটী স্তর বেশ স্পষ্ট হয়। সময়ের প্রকৃতিতে এই পাঁচটী জ্ঞানের বিকাশ সাধকগণকে ব্রহ্ম জ্ঞানে সাহায্য করে বলিয়া উপাসনার জন্য এই পাঁচটী সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপাসনা কি?

যাহা কিছু সুন্দর, জ্ঞানময়, তৃপ্তিময়, ত্যাগময়, পবিত্র ও পূর্ণ উহা আত্মারই বহির্লক্ষণ। এজন্য সেই সব বস্তু বা তত্ত্বের দিকে আমাদের মনের একটা স্বাভাবিক ও পবিত্র আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের নামই উপাসনা। তোমরা 'ভক্তি' বলিতে যাহা বোঝ উহারই নাম উপাসনা। উপ = সমীপ। আসন = স্থিত হওয়া বা বসা। উন্নত তত্ত্বের নিকটস্থ হওয়া অথবা ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম তত্ত্বে শ্রদ্ধাময় অনুষ্ঠানই উপাসনা। উপাসনার অনুষ্ঠান না করিলে আমাদের মন অন্তরমুখী হয় না। কাজেই মনের শান্তি ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যক। যাহারা উপাসনা করে না তাহারা ভাল কর্ম্মী হইতে পারে না। কাজেই তোমরা একদিনও উপাসনায় অবহেলা করিবে না। সমস্ত জীবনের মধ্যে উপাসনা সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠান। হিন্দুদের উপাসনা বিধি এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও উচ্চ দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। মানুষের মনোবিকাশ ও মনুষ্যত্ব লাভের জন্য এই উপাসনা আশ্চর্য্য প্রকারের দৈব অনুষ্ঠান।

নৈমিত্তিক উপাসনা বৎসরের বিশেষ কোন দিনে বা মাসের মধ্যে বিশেষ কোন তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। নৈমিত্তিক উপাসনা নিত্য করিবার প্রয়োজন হয় না। নিত্য, নৈমিত্তিক ভেদে সব উপাসনায় মোট সাতটি প্রকার আছে।

১। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা বা মহাশক্তি উপাসনা। ইহাকে সন্ধ্যোপাসনা বলে।
২। সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা বা পঞ্চ দেবতা উপাসনা।
৩। অবতার উপাসনা।
৪। মহাপুরুষ উপাসনা।
৫। দেবতা উপাসনা।
৬। পিতৃ উপাসনা।
৭। প্রেত উপাসনা।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা

নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা আমাদের সর্ব্ব প্রধান উপাসনা। অন্যান্য উপাসনা এই উপাসনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। সোজা ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর কাহারও লাভ হয় না। এইজন্য উপাসনার শাখা-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সন্ধ্যোপাসনা না করিলে ধর্ম্মের কোন কথাই তোমরা জানিতে পারিবে না। যদি তোমরা নিত্য সন্ধ্যোপাসনা না কর তবে নিজের শরীর ও মনের পুষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিবে। নিত্য যেমন আমাদের শরীর ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করিতে হয় ঠিক সেইরূপ নিত্য মনের ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্যও বৈজ্ঞানিক উপাসনা করিতে হয়।

বেদে সকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালীন উপাসনার উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। যোগিগণ ও উন্নত স্তরের সাধকগণ মধ্য রাত্রি ও শেষ রাত্রি কালে সন্ধ্যোপাসনা করেন। বেদে শেষ রাত্রি ও সূর্য্যোদয়ের মাঝামাঝি সময় ব্রাহ্ম-সন্ধ্যার উপদেশ দিয়াছেন। এই সন্ধ্যাকে যদি সূর্য্যোদয়কালে করা যায় তবে উহা 'ব্রহ্মাণী' বা সৃষ্টিকারিণী শক্তির উপাসনায় পরিণত হয়। তোমরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। এই সন্ধ্যোপাসনা অতীব সুখদ। দুই চার দিন অনুষ্ঠান করিবার পরেই তাহা বুঝিতে পারিবে। সন্ধ্যাগুলিকে ব্রহ্মাণী-সন্ধ্যা (প্রাতঃ), বৈষ্ণবী-সন্ধ্যা (মধ্যাহ্ন), সায়ং-সন্ধ্যা (শিবানী), তুরীয় সন্ধ্যা (মধ্য রাত্রি বা শয়নের পূর্ব্বে শয্যায় বসিয়া করিলেই চলে। এই সন্ধ্যাই 'কালী' নামে খ্যাতা), ও ব্রহ্ম সন্ধ্যা বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম ধ্যান সহ ব্রহ্ম সন্ধ্যা করিতে হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে আত্মাই আসল সত্ত্বা। নিত্য ত্রিসন্ধ্যানুষ্ঠান করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ সাম্য থাকে। এই জন্য শরীর ও মন সাম্য থাকে; স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এইজন্য এই শরীরে আত্মার নিবাসের যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়। কাজেই দেখিতে পাইতেছ আয়ু ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য। যাহাতে তোমরা নিত্য সহজে অথচ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তিতে সন্ধ্যোপাসনা করিতে পার এইজন্য তিন প্রকারের সন্ধ্যাবিধি বলা যাইতেছে - (১) সংক্ষেপ, (২) অতিসংক্ষেপ ও (৩) বিস্তারিত।

প্রথম সংক্ষেপে বিধি বলা যাইতেছে। সন্ধ্যাবিধি সমবেত অনুষ্ঠান করিলে বেশী শক্তিশালী হয়। তোমরা প্রাতঃ সন্ধ্যা একা একা করিবে, এবং সায়ং সন্ধ্যা সমবেত ভাবে করিবে। অন্যান্য সন্ধ্যা যেমন সুবিধা করিবে।

প্রাতে পূর্ব্বাভিমুখে ও অন্যান্য সময়ে উত্তরাভিমুখী হইয়া করিবে। যদি বসিবার সুবিধা না থাকে তবে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে। সমবেত উপাসনায় প্রথম প্রথম একজনকে অগ্রগায়ক করিবে। যাহার সুর সকলের বেশী অনুকুল তাহাকে অগ্রগায়ক করিবে। সন্ধ্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালন করিলে সন্ধ্যানুষ্ঠান বেশী শক্তিশালী হয়। অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া বা বিশেষ কোন ব্যাধি লইয়া সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে হইলে একটু দূরে অবস্থান করিয়া উপাসনা করিবে।

সংক্ষেপে সন্ধ্যার ক্রম

১। মূলাধারে কুণ্ডলিনী নামক মহাশক্তিকে ধ্যান করিবে। মূলাধারে বিদ্যুৎ কণা বা বিদ্যুৎ লতার মত ইহাকে ২, ৫ সেকেণ্ড ধ্যান করিলেই চলে।

২। সহস্রারের মধ্য স্থলে পরব্রহ্ম (শুদ্ধ স্ফটিক বর্ণ বিন্দু) ধ্যান করিবে। সহস্রারের কেন্দ্র স্থলকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে। ইহাই ব্রহ্মস্থান। মস্তিষ্কের একেবারে শেষপ্রান্তে এই কেন্দ্র বিদ্যমান। মস্তিষ্কস্থিত নাড়ী ও কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্র।

প্রাণায়াম। মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যান করিবার পর মহাব্যাহৃতি মন্ত্র স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়। পূরক, রেচক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের এই তিনটি ক্রিয়া আছে। দক্ষিণ নাসাপুট ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ

দ্বারা টিপিয়া ধরিতে হয় এবং বাম নাসায় বায়ু ধীরে ধীরে টানিতে হয়। শ্বাস টানিবার সময় নাভিস্থানে অর্থাৎ মণিপুরে মনকে একাগ্র রাখিবার জন্য সেখানে রক্ত বর্ণ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে হয়। একটি রক্ত বর্ণ ছোট শিবলিঙ্গ বা একটি লাল বর্ণ দীপকলিকা মণিপুরে (ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৩নং কেন্দ্রে) ধ্যান করিতে করিতে পূরক করিবে। পূরক হইয়া গেলে অনাহত স্থানে (ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৪নং কেন্দ্র) মনকে একাগ্র রাখিতে হয়। এইজন্য অনাহতে বিষ্ণু ধ্যান (নীল বর্ণ দীপ কলিকা) করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া বায়ু রুদ্ধ রাখিবে এবং দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা সহযোগে টিপিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। নাসা পথ রুদ্ধ করিয়া মনে মনে মহাব্যাহৃতি পাঠ করিবে। ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করাকে রেচক বলে। বাম নাসা বন্ধই রাখিবে এবং দক্ষিণ নাসা পথ খুলিয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করিবে। রেচন কালে মনে মনে মহাব্যাহৃতি পাঠ করিবে।

এইভাবে বায়ু রেচন হইবার পর আবার পূরক করিতে হইবে। এবার পূরক কালে ডান নাসায় বায়ু টানিতে হইবে। এবং যথাবিধি কুম্ভক করিবার পর বাম নাসায় রেচক ক্রিয়া করিতে হইবে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বারের প্রাণায়াম হইল।

দ্বিতীয় বারের প্রাণায়াম হইয়া যাইবার পর তৃতীয় বারের প্রাণায়াম করিবে। এই প্রাণায়ামে পূরক ক্রিয়া পূর্ব্ব লিখিত প্রথম প্রাণায়ামের মত বাম নাসায় আরম্ভ হইবে এবং পূরক ও রেচক আদি সব ক্রিয়া প্রথম প্রাণায়ামের মত সম্পন্ন করিতে হইবে। এইরূপ তিনবারের প্রাণায়ামে একটী প্রাণায়াম হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করিবার জন্য ইহাকে মূল বন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ ও জালান্ধর বন্ধ ক্রিয়া যোগ করিতে হয়। এই সব ক্রিয়া অভিজ্ঞ যোগীর নির্দ্দেশ ভিন্ন করা যায় না। তবে পূরক, কুম্ভক ও রেচক সংযুক্ত প্রাণায়াম যে কোন লোকের নিকট শিক্ষা করিয়া লইতে পারিবে।

এই প্রাণায়ামকে বৈদিক প্রাণায়াম বলে। ইহাতে পূরক, কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়ার সময় এক সমান থাকে। যোগের অধিকাংশ প্রাণায়ামই পূরক ১, কুম্ভক ৪ এবং রেচক ২ বিধানে হইয়া থাকে। প্রাণায়ামে মন অন্তর্মুখী হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং মন ব্যাপক হইতে সুযোগ লাভ করে। তোমরা যতদিন প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিবে না ততদিন প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে ৩, ৪, ৫ সূত্র অনুসরণ করিবে।

৩। পুনঃ মূলাধারে মহাশক্তি ধ্যান করিবার পর মণিপুরে (ব্রহ্ম নাড়ী চিত্রে ৩ নং কেন্দ্রে) ব্রহ্মাকে ধ্যান (একটী রক্ত দীপ কলিকা বা শিবলিঙ্গ ধ্যান) করিয়া মহাব্যাহৃতি পাঠ করিবে। যথা - ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপো, জ্যোতি, রসঃ, অমৃতং ব্রহ্ম, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, ওঁ। (তিনি ভূর্লোক স্বরূপ, তিনি ভূবঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক স্বরূপ। তিনি সবিতা দেবতার পূজনীয় তেজ স্বরূপ, তাঁহাকে ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিতে নিজের শক্তি প্রেরণ করুন। তিনি আপঃ (জীবন) স্বরূপ, তিনি জ্যোতি (তেজ, বীর্য্য), তিনি রসঃ স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ, তিনি অমৃত (অমর আত্মা), তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি ইচ্ছা, তিনি ক্রিয়া, তিনিই জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই ওঁ স্বরূপ।)

৪। পূর্ব্বোক্তরূপে মহাব্যাহৃতি পাঠ করিবার পর অনাহতে বিষ্ণুকে (নীলবর্ণ দীপ কলিকা বা শিবলিঙ্গ) ধ্যান করিয়া মহাব্যাহৃতি (ওঁ ভূঃ ইত্যাদি) পাঠ করিবে।

৫। এইরূপ অনাহত ধ্যান করিয়া মহাব্যাহৃতি পাঠ করিবার পর আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থিত শিব পিন্ডে (ব্রহ্ম নাড়ী চিত্রে ৬ নং কেন্দ্র) শ্বেত বর্ণ শীতল শিব লিঙ্গ বা দীপ কলিকা ধ্যান করিয়া মহাব্যাহৃতি (ওঁ ভূঃ ইত্যাদি) পাঠ করিবে।

৬। তোমরা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রাণায়াম করিবে অথবা ৩, ৪, ৫ সূত্র অনুসরণ করিয়া মহাব্যাহৃতি পাঠ করিয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান করিয়া গায়ত্রী তিন বার বা ১০ বার করিবে এবং ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিবে।

(ক) গায়ত্রী :- ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

তিনি (ব্রহ্ম, মহাশক্তি বা পরমাত্মা) ওঁ স্বরূপ, তিনি ভূ ভুবঃ এবং স্বঃস্বরূপ, তিনি সবিতৃ দেবতার পূজনীয় তেজ, তাঁহাকে ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধি শক্তিতে নিজের শক্তি প্রেরণ করুন।

(খ) ব্রহ্ম স্তোত্রম্ -

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্ব-রূপাত্মকায়।
নমোঽ দ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যম্ ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্, গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥ ৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপোঽবিনাশ্যঽ নির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত-তত্ত্ব জগৎভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪
তদেকং স্মরামঃ তদেকং ভজামঃ তদেকং জগৎ সাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানম্ নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫
পঞ্চ রত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভুত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়ৎ॥

ব্রহ্ম স্তোত্রের অর্থ -

ওঁ সমগ্র বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ 'সৎ' (ব্রহ্মকে) কে প্রণাম। বিশ্বরূপাত্মক 'চিৎ' (ব্রহ্মকে) কে প্রণাম। অদ্বৈত তত্ত্ব ও মুক্তি দান কারী তোমাকে প্রণাম, নির্গুণ ও ব্যাপক ব্রহ্মকে প্রণাম॥ ১॥ তুমিই একমাত্র শরণ্য (যাঁহার আশ্রয় লওয়া যায়), তুমিই একমাত্র পূজনীয়, তুমিই একমাত্র জগতের 'কারণ' ও বিশ্বরূপ। তুমিই একমাত্র পরম (শ্রেষ্ঠ), নিষ্কল (যে তত্ত্বের ক্ষয় অথবা অংশ হয় না) এবং নির্বিকল্প (বিকল্প রহিত)॥ ২॥ তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ; প্রাণীদের গতি (প্রাণীদের লক্ষ্য অর্থাৎ বিকাশের শেষ স্তর)। পাবনের পাবন (পবিত্রকারীদেরও পবিত্রকারী), তুমি সমস্ত পদের শ্রেষ্ঠ পদ, তুমি একমাত্র (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের) নিয়ন্তা; যাহা শ্রেষ্ঠ তুমি তাহারও শ্রেষ্ঠ; রক্ষকদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ রক্ষক॥ ৩॥ হে প্রভো, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, তুমি সর্ব্বস্বরূপ হইলেও তোমাকে বুঝা যায় না এবং তুমি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও সত্য স্বরূপ। তুমি অচিন্ত্য, অক্ষর, ব্যাপক ও অব্যক্ত তত্ত্ব, তুমি জগৎ ভাসকাধীশ (যাহা দ্বারা জগৎ আলোকিত হয় উহার ঈশ্বর) ও ক্ষয় উদয় রহিত॥ ৪॥ একমাত্র তোমাকে স্মরণ করি, একমাত্র তোমাকেই জপ করি এবং জগতের সাক্ষীস্বরূপ একমাত্র তোমাকেই প্রণাম করি। তুমি একমাত্র 'সৎ' একমাত্র নিধান (আশ্রয় স্বরূপ), তুমি নিরালম্ব (যিনি কাহারও আশ্রিত নহেন এবং সকলের আশ্রয়)। তুমি ঈশ্বর, সংসার সাগরের পোত, তোমার আশ্রয় লইতেছি॥ ৫॥ পাঁচটি রত্ন স্বরূপ এই পরমাত্মা ব্রহ্ম স্তোত্র; যে ইহা একাগ্র মনে পাঠ করে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

অতি সংক্ষেপে সন্ধ্যোপাসনা -

১ হইতে ৬ (খ) নং সূত্রই সংক্ষেপ সন্ধ্যোপাসনা। যদি ইহা হইতেও সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিতে চাও তবে ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান করিয়া গায়ত্রী তিন বার পাঠ করিবে এবং ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিবে। বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনা পুস্তকের শেষ ভাগে দেওয়া হইল।

তোমরা সন্ধ্যা অনুষ্ঠান নিত্যই করিও। বিস্তারিত, সংক্ষেপ অথবা অতি সংক্ষেপ যেমন সুবিধা করিও। ইহা দ্বারা মেধা, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, আয়ু ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং যুক্তিবাদ প্রবল হয়। মুখের লাবণ্য, চোখের

জ্যোতি ও মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর ইহাই একমাত্র উপাস্য। আর সব উপাসনা ইহার শাখা প্রশাখা মাত্র। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুরা দার্শনিক ঈশ্বরের উপাসনা জানে। অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসনা ইহার তুলনায় ছেলেখেলা তুল্য। অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসনার প্রার্থনাগুলি আমাদের উপাসনার সঙ্গে তুলনা করিলে সব বুঝিতে পারিবে।

মহাব্যাহৃতির কথা

মহাব্যাহৃতি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা স্পষ্ট করা যাইতেছে।

তোমরা গীতা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে - ওমি ত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ গীতা ৮-১৩॥ ওঁ রূপ এক অক্ষর ব্রহ্মরূপ আমাকে ব্যাহৃতি সহিত স্মরণ করিতে করিতে যিনি শরীরকে ত্যাগ করিতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। এই সম্বন্ধে গীতার আরও একটি শ্লোক বলা যাইতেছে; প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮-১০॥ মৃত্যুকালে নিশ্চল মনে এবং ভক্তি ও যোগবলে প্রাণকে সম্যকরূপে ভ্রুমধ্যস্থানে (শিবপিণ্ডে) স্থাপনা করিতে পারিলে সে পরম দিব্য পুরুষ লাভ করে॥ ভ্রুমধ্যস্থান ব্যাহৃতি জগতের একটি কেন্দ্র। এই ব্যাহৃতি বস্তুটি যে কি উহা বুঝিতে না পারিলে তোমাদের উপাসনার কোন লক্ষ্যই সিদ্ধ হইবে না। মৃত্যুকালে এই ব্যাহৃতিকে স্মরণ করিতে হইলে সমস্ত জীবনে এই ব্যাহৃতি স্মরণ করিবার অভ্যাস রাখিতে হয়। এ সম্বন্ধে বেদেরও আদেশ দেখ -

ওঁ শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য
স্তাসাং মূর্দ্ধণ্যমতি নিঃসৃতিতৈকা।
তয়োর্দ্ধ মায়ন্নমৃতত্ব মেতি
বিষ্বঙ্ঙ্ন্যা উপক্রমণে ভবন্তি॥ কঠ উ, ১২৫॥

হৃদয় মধ্যে (মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত স্থানের নাম হৃদয়) এক শত একটী নাড়ী আছে (ক্রম বিকাশ ৮ম অধ্যায় দেখ)। উহাদের মধ্যে একটি নাড়ী ব্রহ্ম রন্ধ্রের অভিমুখে নির্গত হইয়াছে। (মানুষ) সেই নাড়ীদ্বারা উর্দ্ধে গমন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে। এই ব্রহ্ম নাড়ীটী ভিন্ন অন্য নাড়ী বিভিন্ন লোকে গমনের কারণ হয়।

এই ব্রহ্ম নাড়ীই ব্যাহৃতি। সর্ব্বদা এই নাড়ী বা ব্যাহৃতি ধ্যান সহ 'ওঁ' জপ করিতে হয়। ব্রহ্ম নাড়ী = ওঁ = ব্যাহৃতি = গায়ত্রী = ব্রহ্ম স্তোত্রের ব্রহ্ম = আত্মা = পরমাত্মা = মহাশক্তি = গুরু। উন্নত যোগ বিধান বা সাধনার সাহায্যে মন যখন এই ব্রহ্ম নাড়ীতে ঠিক ঠিক প্রবেশ করিবে তখনই মন একাগ্র ও ব্যাপক হইবে। এবং তখনই জ্ঞানও হইবে। সেই সব বিধান এখানে আলোচিত হইবে না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক স্থানে 'মাং' (আমাকে), 'অহং'(আমি) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্রহ্ম ধ্যান ও সাধনার ইসারা দিয়াছেন। আমরা কয়েকটি স্থান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি -

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ"। ১১-৫॥

হে পার্থ, আমার শত শত প্রকারের ও সহস্র সহস্র প্রকারের রূপ দেখ।

"মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি"। ১১-৭॥

হে জিতনিদ্র, আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও আমার দেহে দেখ।

"মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু"। ১৮-৬৫॥

আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর।

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৯-৩২॥

হে পার্থ, যাহারা পাপ যোনি লাভ করিয়াছে (অসুর, ম্লেচ্ছ ও যবনাদি), যাহারা স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র তাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ ব্রহ্ম নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া) পরম গতি লাভ করে।

এইরূপ 'আমি' শব্দের ব্যবহার কেবলই গীতায়ই হয় নাই; কথোপকথন কালে তন্ত্রাদি বহু শাস্ত্রে শিষ্যকে উপদেশ কালে এইরূপ 'আমি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ গুরু, আত্মা বা ব্রহ্ম বুঝিয়া লইবে।

অনেক ভাববাদী মহাত্মা ও আধুনিক প্রচারকগণ গীতার উপাস্য তত্ত্বের এই নিগূঢ় নীতিকে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এবং শক্তিবাদী মহাপুরুষকে নিজেদের মনের মত ভাববাদী কৃষ্ণ সাজাইয়া পৌরোহিত্যবাদীদের কুমতলবের সহায়ক হইয়া হিন্দুর সনাতন উপাসনা বিজ্ঞানকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বিকৃত করিয়াছেন।

তোমরা যদি জ্ঞান, শক্তি, মেধা, যুক্তিবাদিতা ও শান্তি চাও এবং সর্ব্বোপরি সমাজ জীবনকে আবার গড়িয়া তুলিতে চাও তবে আসল বৈদিক বিধানকে ভিত্তি করিয়া লইবে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরু মানিবার দরুণ (শিষ্যস্তেঽহং ইত্যাদি। গীতা ২-৭) তিনি অস্মদ্ (আমি) শব্দ প্রয়োগ দ্বারা জটীল দার্শনিক তত্ত্বকে সহজ করিয়াছেন মাত্র। ইহার আসল লক্ষ্য ঐ ব্রহ্ম নাড়ী বা আত্মা।

গীতার একস্থানে বলিয়াছেন - ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব (অ ৭-৭)। সূত্রে যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে ঠিক সেইরূপ আমাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও জীব জড়িত আছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য সমস্ত প্রকার জগৎ এবং এই সব জগৎস্থিত প্রাণীসকল সকলেই ব্রহ্ম নাড়ীতে গ্রথিত আছে। ইহাতে সন্দেহ নাই। গীতায় মৃত্যুকালীন ধ্যান সম্বন্ধে আরও একস্থানে বলিয়াছেন - "অন্তকালেচ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরং"(৮-৫)॥ অর্থাৎ মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে শরীর ত্যাগ করে॥ মৃত্যুকালে স্মরণীয় বিষয় যে ব্রহ্মনাড়ী এই শ্লোকে তোমরা সেই কথাই জানিবে। এইরূপ অর্থ করা ভিন্ন বিভিন্ন স্থানের উক্তিতে অসামঞ্জস্য হইবে।

এবার চিত্র দ্বারা ব্রহ্মনাড়ী ও মহা ব্যাহৃতি বুঝানো যাইতেছে। চিত্র পরিচয় পাঠ কর।

এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত এবং পরে শিব পিণ্ডের উপরিস্থিত নাড়ী অংশ সব মিলাইয়া ব্রহ্মনাড়ী। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১০ নং এবং ৮ নং রেখা ব্রহ্মনাড়ী।

তোমরা জান 'বৃহৎ মস্তিষ্ক' মস্তিষ্কের উপরিভাগে ডানে ও বামে দুই টুকরায় অবস্থিত। কাজেই শিব পিণ্ড পর্য্যন্ত যাইবার পর ব্রহ্ম নাড়ী উভয় মস্তিষ্কে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও ধ্যানকালে দুইভাগে ভাগ করিয়া ধ্যান করিবে না। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধ অংশে ব্রহ্মনাড়ী দুইভাগে বিভক্ত হইলেও শিব পিণ্ডে কয়েকটি শাখা নাড়ী দ্বারা সংযোগ লাভ করিয়াছে। কাজেই ধ্যান কালে মস্তিষ্কে দুইটী নাড়ী ধ্যান করিতে হয় না। এবার চিত্রের অন্যান্য অংশ দেখ।

১ = ভূঃ = মূলাধার।

২ = ভুবঃ = স্বাধিষ্ঠান।

৩ = স্বঃ = মণিপুর।

৪ = মহঃ = অনাহত।

৫ = জনঃ = বিশুদ্ধাখ্য।

৬ = তপঃ = আজ্ঞা। এই কেন্দ্রেই শিব পিণ্ড।

৮ = সত্য = সহস্রার কেন্দ্র।

৭ = গুরুপাদুকা স্থান বা সহস্রার গর্ভস্থান।

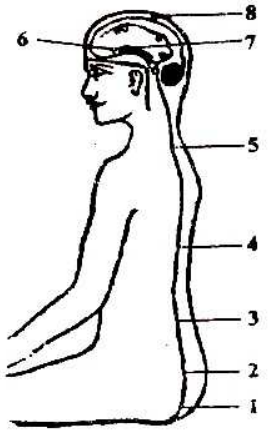

ব্রহ্মনাড়ী চিত্র

গায়ত্রীতে যে ব্যাহৃতি আছে, উহা ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ।

ভূঃ = ইচ্ছাশক্তি। ১, ২, ৩ কেন্দ্র মিলিয়া ভূঃ।

ভুবঃ = ক্রিয়া শক্তি = ৪ কেন্দ্র।

স্বঃ = জ্ঞান শক্তি = বিশুদ্ধাখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত সমস্ত ব্রহ্মনাড়ী অংশ।

কেহ কেহ উপাসনার মধ্যস্থিত এই সব উন্নত তত্ত্ব বালক বালিকাগণকে না শিখাইবার পক্ষপাতী হইতে পারেন; কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিবে উপাসনার জ্ঞান এক দিনে লাভ হয় না। সমস্ত জীবনের সাধনায় ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। উপাসনার তত্ত্ব বিষয়ক এই সব উন্নত জ্ঞান না জানিলে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথাই জানা হইল না। এই জন্য উপাসনার শিক্ষা দান কালে ঠিক ঠিক জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য ঋষিগণ ৫ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত সময়কে উপনয়ন কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যাহারা মূর্ত্তি ধ্যানের পক্ষপাতী তাহারা ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রে শক্তিমূর্ত্তি বা শক্তিশালী গুরু ধ্যান করিবে।

আমাদের দেশে এখন পৌরোহিত্যবাদিতা, ভাববাদিতা ও বুদ্ধিহীনতা এবং মূর্খতা ধর্ম্মের নামে অনেক কিছু চলিতেছে। কিন্তু তোমরা এ কথা ভাল ভাবেই জানিয়া রাখিবে - এই যে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ী এবং এই ব্রহ্মনাড়ীর অসংখ্য শাখা নাড়ী, ইহারাই হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি। বৈদিক, তান্ত্রিক, যৌগিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সমস্ত হিন্দু শাখাই এই ব্রহ্মনাড়ী অংশকে কেন্দ্র করিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকে। কাজেই তোমরা দেখিতে পাইতেছ সব হিন্দুরাই ব্রহ্মোপাসক এবং সমস্ত প্রকার হিন্দুধর্ম্মের শাখা প্রশাখাতেই 'ব্রহ্মনাড়ী' এবং 'ওঁ' এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত।

মধ্যযুগে বৌদ্ধবাদ বিলুপ্তির পর আমাদের দেশে পৌরোহিত্যবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন সন্ধ্যাবিধি পৌরোহিত্যবাদীরা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া সমাজকে উহা হইতে বঞ্চিত করে। তাহার পর 'ভাবুক' মহাত্মারা নানা প্রকারের উপধর্ম্মকে সমাজে প্রচার করিবার দরুন এই শক্তিশালী উপাসনা অংশ হইতে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

তোমরা বলিতে পার বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এবং বাংলার বাহিরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তো বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করেন এবং বৈদিক উপাসনাও করেন, তবে তাঁহারা কেন নিস্তেজ হইয়া গেলেন?

উত্তর:- উপনয়নের সাধনাকে আয়ত্ত করিতে হইলে আরও অনেক উন্নত স্তরের যোগবিধান শিক্ষা করিতে হয়। সমাজে সেই সব বিধানের কোন শিক্ষাই দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। বরং যে টুকু সন্ধ্যোপাসনার কথা আছে উহাও কেহ যথাযথ ভাবে করেন না।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এই বিধানে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতগুলি হীন এবং অনুদার শিক্ষা পাইয়া থাকে যাহাতে তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সব শ্রেণীর মানুষকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা পায়। এই বিদ্বেষবাদিতাই এই সংস্কারের সব লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া ইহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া দিতেছে। তোমরা বঙ্গদেশীয় উপনয়ন সংস্কারের সময় উপস্থিত থাকিও এবং কাশীতে সংস্কৃত পাঠশালাগুলিতে বিচরণ করিও। তাহাতে ধর্ম্ম ও সংস্কৃত শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উৎকৃষ্ট অংশকে (ব্রাহ্মণগণকে) কিভাবে বিদ্বেষবাদী করিয়া গড়িয়া দেওয়া হয় দেখিতে পাইবে।

সন্ধ্যাবেলা তোমরা একটী নৌকাকে তীরে বাঁধিয়া রাখিলে এবং ঐরূপ বদ্ধ অবস্থায়ই সমস্ত রাত্রিতে দাঁড় টানিতে থাকিলে। পর দিন সকাল বেলা ঐ নৌকাটী যেখানে বাঁধা ছিল সেই খানেই থাকিবে না কি? যদি স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা ও বিদ্বেষবাদিতা দ্বারা একজন সাধক নিজেকে আবদ্ধ রাখে তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে তাহার সব সাধনাই ব্যর্থ হইবে না কি?

তোমরা যদি চণ্ডী পাঠ কর তবে কীলক মন্ত্রে দেখিতে পাইবে - দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যথা সা প্রসীদতি। ইত্থং রূপেন কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্॥ অর্থাৎ দিবে এবং নিবে, ইহা ভিন্ন তিনি প্রসন্ন হন না। এইরূপ কীলক দ্বারা মহাদেব শক্তিতত্ত্বকে কীল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ নিজের ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞানতা, স্বার্থপরতা, মলিনতাগুলিকে মহাশক্তিতে বিসর্জ্জন দাও এবং মহাশক্তির ব্যাপকত্ব, মহত্ত্ব, জ্ঞান, নির্ম্মলতা, উদারতা ও তেজস্বিতাকে নিজে গ্রহণ কর। এইরূপ বিজ্ঞানে চণ্ডীতত্ত্বে (মহাশক্তি তত্ত্বে) প্রবেশ করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অনুন্নত, স্ত্রী, যবন প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীতে উন্নত সংস্কার ও বৈদিক উপাসনা বিধানকে ছড়াইয়া দাও। দেখিবে, উচ্চ সভ্যতার সংঘর্ষে ও যুক্তিবাদিতায় আমাদের সমাজজীবন কিরূপ মহান্ ও সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যময় জীবন না হইলে তুমি নিশ্চয়ই নিস্তেজ হইয়া যাইবে। তুমি যদি তেজ অর্জ্জন করিতে চাও তবে সমাজ জীবনকে বিদ্বেষের কোঠায় রাখিয়া মস্ত বড় ‘পণ্ডিতজী’ সাজিলে চলিবে না।

যেখানেই দেখিবে পক্ষপাতিত্ব সেইখানেই উপযুক্তকে বঞ্চিত করা এবং অনুপযুক্তকে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দিবার কুবুদ্ধি নিহিত। ইহা আসুরিক নীতির লক্ষণ। আসুরিক নীতি, বর্ব্বর নীতি ও পৌরোহিত্য নীতি যে কোন দেশ এবং সমাজের জন্য সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া খৃষ্টবাদী ইংরেজ আমাদের দেশের এক একটা অত্যন্ত অনুপযুক্ত সম্প্রদায়কে সুবিধা ভোগী করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করিতেছে। সহস্র বৎসর ধরিয়া পৌরোহিত্যবাদও এইভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরূদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই জন্য উপনয়নের মত শক্তিশালী ধর্ম্ম সংস্কার থাকা সত্ত্বেও আমরা নিস্তেজ হইতেছি।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে সব কথাই কিছু কিছু বলা হইল। এবার সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইবে। সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে পাঁচটি স্তর।

সগুণ ব্রহ্মোপাসনা

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইঁহারা সগুণ ব্রহ্ম। তোমরা যদি পূজাপদ্ধতি পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবে এই সগুণ ব্রহ্ম পঞ্চকের পূজা সমস্ত প্রকার পূজার মধ্যে একই রূপে স্থান পাইয়াছে। শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সূর্য্য বা যে কোন দেবতার পূজাই কর না কেন, পঞ্চ দেবতার পূজা তোমাদিগকে করিতেই হইবে। তোমরা গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি মূর্ত্তি দেখিয়াছ। সগুণ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ পাঁচটি মূর্ত্তি ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমাদের পক্ষে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর বুঝিবার পক্ষে খুবই সুবিধা হইয়াছে। অনেক মূর্খের ধারণা যে হিন্দুরা মূর্ত্তিরই পূজা করিয়া থাকে। তোমরা জানিয়া রাখিও, হিন্দুরা 'আত্মার' উপাসনা মাত্রই করিয়া থাকে। আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরই পঞ্চ দেবতা। মূর্ত্তিগুলি কেবল সেই সব স্তরগুলিকে বুঝাইবার সঙ্কেত মাত্র।

তোমরা দেখিতেছ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এর পর শক্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ মনোবিকাশের চারিটী স্তর অতিক্রম করিবার পর শক্তিস্তর পাওয়া যায়। এই শক্তিস্তরই পূর্ব্বোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার ভিত্তি। শক্তিস্তরে যাইতে হইলে যে সব জ্ঞানের স্তর ভেদ করিতে হয় সেই স্তরগুলিই সগুণ ব্রহ্ম নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এই শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিয়া লইবে। শক্তি ও গতি এক বস্তু।

মনোবিকাশের এই সব স্তরগুলি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মনাড়ীর কথা তোমরা জানিয়াছ। ঐ ব্রহ্মনাড়ী ভিন্ন আরও অসংখ্য নাড়ী আমাদের মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে বিদ্যমান। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এবং মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি মর্ম্মস্থান আছে। ঐ সব মর্ম্মস্থান ও মর্ম্মকেন্দ্র সংযোগকারী বহু তার আছে। ঐ তারগুলিকে নাড়ী বলে। এবং ঐ মর্ম্মগুলিকে ষট্‌চক্র বলে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব কেন্দ্র মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে উভয় স্থানে বিদ্যমান। মস্তিষ্কের গণেশের সহিত মেরুদণ্ডের গণেশ এবং বিষ্ণুর সহিত মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত বিষ্ণুর সংযোগ আছে। এইরূপ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত স্বজাতীয় কেন্দ্রগুলি ও উহাদিগের সংযোগকারী তারগুলি এক স্তরের অনুভূতিতে স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হয়। মনে কর গণেশ স্তরের অনুভূতি ফুটিল; সেই সময় দুইটি গণেশ কেন্দ্র এবং উহাদের সংযোগকারী নাড়ী স্পন্দিত হইতে থাকিবে। সগুণব্রহ্মের অনুভুতিগুলি এবং সেই সব অনুভুতি লাভ করিয়াছেন এইরূপ মহাত্মার বিশেষ লক্ষণই গণেশ, সূর্য্যাদি ধ্যানগুলিতে বিদ্যমান। তোমরা "ক্রমবিকাশবাদ" আলোচনা করিয়া সব কথাই জানিতে পারিবে।

গণেশ - বুদ্ধি, বিবেক, বিচার প্রভৃতির সমষ্টিই গণেশ। আমাদের মস্তিষ্কের কপালের দিকে গণেশ কেন্দ্র বিদ্যমান। এই বুদ্ধির মেরুদণ্ড কেন্দ্র হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহতে অবস্থিত। ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৪ কেন্দ্র। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৭ নং কেন্দ্র গণেশ। যোগ শাস্ত্রে ইহাকে ভ্রুমধ্য স্থান বলে।

সূর্য্য - স্নেহ, ভালবাসা ও প্রেমই সূর্য্য। এই কেন্দ্র মস্তিষ্কের পেছনের দিকে অবস্থিত। এই কেন্দ্রে লীলা স্মৃতি অবস্থান করে। ইহারও মেরুদণ্ড শাখা অনাহতে বিদ্যমান (ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৪ কেন্দ্র)। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ২ নং কেন্দ্র 'সূর্য্য'।

বিষ্ণু - সমাজ প্রেমই বিষ্ণু। ইহার কেন্দ্র মস্তিষ্কের পেছনের দিকে বিদ্যমান। আমরা যে স্থানে শিখা রাখি সেই স্থানের সমসূত্র স্থানে মস্তিষ্কের মধ্যে এই কেন্দ্র অবস্থিত। এখানেও আমাদের স্মৃতি ও কর্ম্মফল জমা থাকে। তবে এখানে স্মৃতির সূক্ষ্ম অংশ জমা থাকে। ইহাকে সুখস্মৃতি বলা যায়। নিদ্রাকালে জীবমাত্র এই কেন্দ্রে বিশ্রাম লয়। কিন্তু স্বপ্নকালে জীবের স্থিতি সূর্য্য কেন্দ্রে হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের মধ্যে অনাহতে ইহার কেন্দ্র বিদ্যমান। মস্তিষ্কের বিষ্ণু কেন্দ্র মস্তিষ্ক পরিচয় চিত্রে ৩ নং কেন্দ্রকে জানিবে।

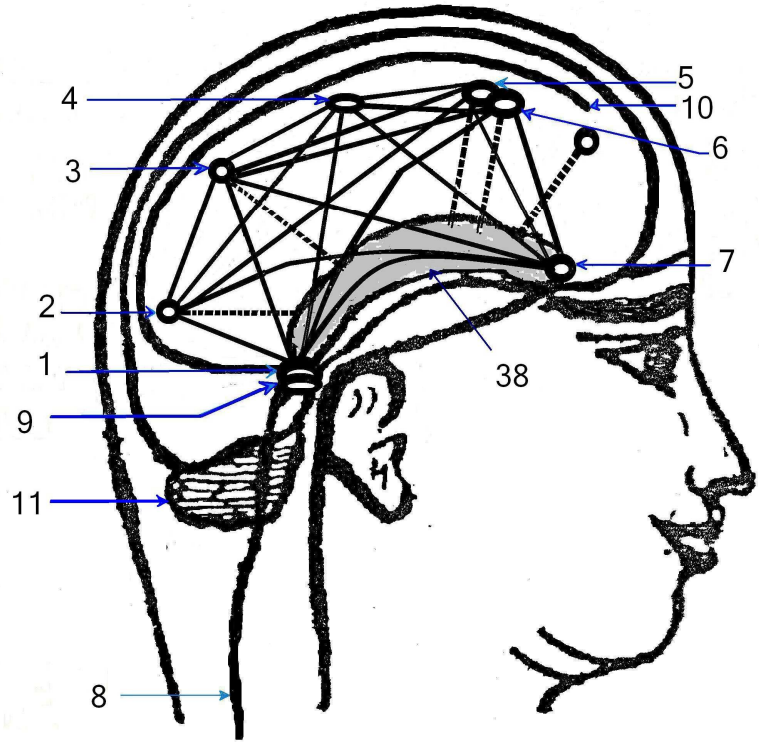

মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্র

১। মনের কেন্দ্র।
২। সূর্য্য কেন্দ্র।
৩। বিষ্ণু কেন্দ্র।
৪। শিব কেন্দ্র।
৫। উন্নত শিব কেন্দ্র।
৭। গণেশ কেন্দ্র।
৮। মেরুদণ্ডগত ব্রহ্মনাড়ী বা শক্তিনাড়ী।
১০। মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ী বা শক্তিনাড়ী।
১১। ছোট মস্তিষ্ক বা প্রাণ মস্তিষ্ক।
৩৮। শিব পিণ্ড।

শিব - শান্তিই শিব। মস্তিষ্কে দুইটি শিব কেন্দ্র বিদ্যমান। উহার একটী শান্তি প্রধান শিবকেন্দ্র এবং অন্যটী জ্ঞান প্রধান শিবকেন্দ্র। মেরুদণ্ডগত শিব কেন্দ্র বিশুদ্ধাখ্য এবং স্বাধিষ্ঠানে বিদ্যমান। মস্তিষ্ককেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪ = শান্তি প্রধান শিব। ৫ = জ্ঞান প্রধান শিব। ব্রহ্মনাড়ীর পরিচয় চিত্রে ৫ = বিশুদ্ধাখ্য এবং ২ = স্বাধিষ্ঠান। এই কেন্দ্র হইতে সর্ব্বদা একটা শান্তি রস স্রাব হয়। বেদে এই রসকে সোমরস বলে। ইহাদ্বারা আমাদের মন স্নিগ্ধ থাকে। এই স্রাবকে কোন কোন শাস্ত্রে গঙ্গার ধারা বলিয়াছে। এখান হইতে এই স্রাব মেরুদণ্ড মধ্যগত নাড়ী মণ্ডলকে স্নিগ্ধ করিয়া সমস্ত শরীরকে স্নিগ্ধ ও নীরোগ করে। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট উপাসনা করিও। এই স্রাবধারা তোমাদিগকে নীরোগ করিতে সাহায্য করিবে।

শক্তি - মানুষের ঈশ্বরত্বই 'শক্তি'। রাজশাসনের নীতি ও রাজপালনের নীতিতে - আসুরিকতা, বর্ব্বরতা, শোষণ ও গুণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়া সমাজকে সুখী ও বিকাশানুকূল রাখার যে শক্তি উহাই ঈশ্বরত্ব। আসুরিকতার বিরুদ্ধ শক্তিই ঈশ্বরত্ব। মস্তিষ্কের সবগুলি কেন্দ্র এবং মেরুদণ্ডমধ্যগত সবগুলি মর্ম্মস্থান একটী নাড়ীর আশ্রয়ে অবস্থান করে এই নাড়ীই শক্তিনাড়ী। ইহাকে আমরা ব্রহ্মনাড়ী বলিয়াছি। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১০ চিহ্নিত ও ৮ চিহ্নিত নাড়ীই শক্তি বা ব্রহ্মনাড়ী। সন্ধ্যোপাসনার ক্রমধারায় ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণীর কথা তোমাদের মনে আছে। এইভাবে তিনটী সন্ধ্যোপাসনা করিয়া আমরা তুরীয়া সন্ধ্যা উপাসনায় ব্রতী হই। এই দিকেও আমরা ক্রম উপাসনায় শিব স্তর ভেদ করিলে ঐ তুরীয় শক্তিই পাইয়া থাকি। দুইটী লক্ষ্য একই, তবে একটীতে প্রাকৃতিক নিয়মকে বা সময় প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া উপাসনা করা হয়, অন্যটীতে মনের বিকাশ ক্রমকে অতিক্রম করিয়া শক্তিস্তরে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রহ্মাণী ও সূর্য্য, বৈষ্ণবী ও বিষ্ণু এবং রুদ্রাণী ও শিবস্তর প্রায় একপ্রকার তত্ত্ব। ইঁহাদের মধ্যে যে সামান্য ভেদ আছে উহা তোমাদের পক্ষে বুঝিতে জটিল হইবে তবুও এসম্বন্ধে বলা যাইতেছে - আমরা যতক্ষণ জীবাত্মবোধে বদ্ধ থাকি ততক্ষণ শক্তি বা ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে অক্ষম। শিবস্তর ভেদ হইবার পর আমাদের জীবাত্মবোধ শেষ হয় তখনই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী প্রভৃতি শক্তিজ্ঞান আমরা অনুভব করিতে সক্ষম। জীবাত্মবোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণুস্তর অনুভব করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী শক্তিকে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী শক্তির আভাষ মাত্র সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবস্তরে বিদ্যমান। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৭ম অধ্যায়ে দেখ।

গণেশ = বিবেক, ত্যাগ ও সংযমের সমষ্টি।

শিব = মনের শান্তি, তপস্যা, ও বিষয়ে অত্যন্ত নিবৃত্তি।

গণেশ এবং শিবজ্ঞান সিদ্ধ হইলে বিকাশ তুরীয় স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমাদের মনোবিকাশের ক্রমগুলির নাম পঞ্চ দেবতা বা পাঁচটি সগুণ ব্রহ্ম। এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মগুলির নাম ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ও তুরীয়া। আমরা জীবত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শিবত্ব লাভ করিলেই শক্তিতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারি।

শিক্ষক এবং বিদ্যার্থিগণ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অত্যন্ত দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান সম্পদ দেখিয়া ভয় পাইবেন না। হিন্দুধর্ম্ম সস্তায় বিশ্বাসবাদের ধর্ম্ম নহে। ধৈর্য্য ধরিয়া আলোচনা করুন। ক্রমে সবই সহজ হইয়া উঠিবে।

সগুণ ব্রহ্মস্তরের সবগুলি অনুভুতিই ব্যাপক। যুগপৎ এতগুলি অনুভুতি ব্যাপক কি ভাবে হইতে পারে সে সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক চৌবাচ্চায় জল রহিয়াছে। তাতে লাল রং মিলাইয়া দাও। উহাতে কিছু লবণ মিলাও। উহাতে চিনি গুলিয়া দাও। এবার চৌবাচ্চার জলগুলি খুব আলোড়ন করিয়া লও। এখন চৌবাচ্চার দিকে তাকাও। একজন বলিল, চৌবাচ্চায় জল ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, চৌবাচ্চায় লাল রং ব্যাপ্ত আছে। একজন একটু পান করিয়া বলিল, এতে নুন ব্যাপক ভাবে বিরাজমান। অন্য জন পান করিয়া বলিল, এতে চিনি ব্যাপ্ত আছে। তোমরা দেখিতেছ কেহই মিথ্যা বলে নাই। এখন তুমি যদি প্রত্যেকটী জল কণা বিশ্লেষণ কর তবে দেখিতে পাইবে, জল কণাগুলিতে এমন সব ফাঁক আছে যাহাতে লাল রং, নুন, ও চিনি কণাগুলি স্থান পাইয়া আছে। ঠিক এইরূপ সগুণ ব্রহ্মের অনুভুতিগুলি প্রথম প্রথম সাধকের

নিকট ব্যাপক মনে হয় কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অনুভূতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক আছে। ক্রমে সেগুলি ধরা পড়ে এবং অন্য স্তরের অনুভূতি আসিবার পথ হয়। নির্গুণ ব্রহ্মস্তরের অনুভূতিতে ফাঁক থাকে না।

মূর্ত্তি বিজ্ঞান

(নারায়ণ শিলা ও শিবমূর্ত্তি)

আমাদের ধর্ম্মে শালগ্রাম নারায়ণ ও শিবমূর্ত্তি নামক দুইটী বিচিত্র মূর্ত্তি আছে। এই দুইটী মূর্ত্তি যে কি ইহা তোমাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিগত ২০০০ বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার মিথ্যা কথা প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে। বাইবেল এবং কুরান মূর্ত্তি সম্বন্ধে অকারণ মিথ্যা প্রচার করিয়াছে। আবার আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদীরা মূর্ত্তির সমর্থক হইলেও অব্রাহ্মণকে ধর্ম্মতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে বহু মিথ্যা কথা কল্পনা করিয়া লিখিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মে শিবমূর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সহিত যোগ বিদ্যার বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবার দরুণ এবং যোগ রহস্য অব্রাহ্মণগণের নিকট গোপন করিবার জন্য পৌরোহিত্যবাদীরা শিবপূজা সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা পুরাণে লিখিয়াছে। ইহার ফলে আজ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে ব্রাহ্মণ সন্তানগণও শিবমূর্ত্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

খুব লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ শিলা দেখিলে দেখিতে পাইবে উহার মধ্যে একটী ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের মধ্যে উপরে ও নীচে সুন্দর ছত্রাকার চক্র আছে। ঐ চক্র দুইটির কেন্দ্র একই বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। যদি তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হও তবে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদকালে ঐ চক্রের মত একটা স্তরের অনুভুতি লাভ হইবে। অনুভুতিতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় - নিজের আত্মসত্ত্বা একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে। সেই বিন্দুর উপরে ও নীচে গলিত সোনার মত রং বিশিষ্ট দুইটী আকাশ ঐ বিন্দুরূপে কেন্দ্রীভূত আমিত্বটীকে যেন চাপিয়া রাখিয়াছে। এই অনুভুতিকালে আর কোন কথাই মনে থাকিবে না। ইহা একটী স্তরের সমাধির অনুভূতি। আমরা খুব গভীর নিদ্রায় এই বিষ্ণুস্তরের সুখেই ডুবিয়া থাকি। নিদ্রাকে তামস সমাধি বলা চলে। যাহা হউক নারায়ণ শিলাতে এই সমাধির রহস্য আছে বলিয়া নারায়ণ শিলাতে বিষ্ণু পূজার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নারায়ণ শিলা, শিবলিঙ্গ, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিমূর্ত্তি সবই ব্রহ্মতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন স্তরের যন্ত্র মূর্ত্তি। এই সব মূর্ত্তিতে যে কোন দেবতার পূজা করা চলে। পূজাবিধান আজকাল এক শ্রেণীর বংশগত ব্যবসায়ে পরিণত হইবার দরুণ পূজাতত্ত্ব হইতে সমাজ দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছে।

এই দিকে ভাববাদীরা পূজার অনুষ্ঠান অংশ ত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিকে সাজানো গোছানোর অনুষ্ঠানকেই পূজা বলিয়া মনে করিতেছে। তোমরা জানিয়া রাখিবে পূজা অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দর, আনন্দ ও উৎসাহপ্রদ যোগ বিদ্যার অনুষ্ঠান। এই উপাসনা কাণ্ডকে পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করা বা শুধু সাজাইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করার অর্থ হইতেছে নিজেরা এইরূপ আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত থাকা ও মূর্খতা করা। সন্ধ্যানুষ্ঠান যেমন নিজেদের অবশ্য কর্ত্তব্য, ঠিক সেইরূপ নৈমিত্তিক উপাসনাও নিজেদেরই কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডে অর্থাৎ দশবিধ সংস্কার (বিবাহ আদি) ব্যাপারে পুরোহিত নিয়োগ করা চলে, কিন্তু কোন প্রকার উপাসনা কাণ্ডেই পুরোহিত নিয়োগ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বঙ্গদেশে ছাত্রগণ কত আনন্দ করিয়া সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমরা ছাত্রগণকে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান নিজদিগকে করিতে বলিতেছি। পূজক, তন্ত্রধারক, সদস্য, নিরীক্ষক প্রভৃতির সমষ্টিতে এক পূজা সভা নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া একাজ সম্পন্ন করিতে বলিতেছি। দেখিতে পাইবে ইহা অতীব আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেখিতে পাইবে পুরোহিতরা কিরূপ ফাঁকী পূজার

অনুষ্ঠান করিয়া পয়সা ও পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকে। যাহাতে খুব সুন্দরভাবে এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে পূজা অনুষ্ঠান হইতে পারে এইজন্য আমরা সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষী ও কালী পূজার বই লিখিবার কথা ভাবিতেছি।

নারায়ণ শিলা যে বিষ্ণুস্তরের অনুভূতির রহস্যপূর্ণ মূর্ত্তি একথা তোমরা জানিলে। তোমরা ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছ যে সমাজপ্রেমই বিষ্ণু। নারায়ণ শিলাতে সমাজপ্রেমের আদর্শও বিদ্যমান। শিলার মধ্যস্থিত সেই আত্মবিন্দুই নেতা। ঐ বিন্দুর উপরিস্থিত চক্রই যোগী ও জ্ঞানীদের সমষ্টি। নিম্নস্থিত চক্রটী সর্ব্বসাধারণের সমষ্টি জানিবে। অর্থাৎ তুমি যদি সমাজকে সেবা করিতে চাও তবে তুমি নিজে যথেষ্ট উচ্চ স্তরের জ্ঞান আয়ত্ত করিবে এবং যোগী, ত্যাগী ও মহাত্মাগণের জ্ঞানশক্তি সর্ব্বদা আকর্ষণ করিবে। এবং সর্ব্বসাধারণকে সংঘবদ্ধ রাখিয়া নিজের মধ্যস্থিত কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তিতে সমস্ত সমাজকে শক্তিশালী রাখিবে। সমাজ সেবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তোমরা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, রাজাগণ এইভাবেই ঋষিগণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন এবং সর্ব্বসাধারণকে ঐ ভাবেই রক্ষা ও পালন করিতেন। যেখানে দেখিতে পাইবে রাজা বা নেতা জ্ঞান, যুক্তিবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে উপেক্ষা করিতেছেন বা জ্ঞানী, যুক্তিবাদী বা ন্যায়পরায়ণগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিতেছেন, সেইখানেই নেতা অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। যুক্তিবাদিতার অবমাননা নেতা বা রাজার দুর্ব্বলতা বা দাম্ভিকতার লক্ষণ। ইহা সমাজ জীবনের বিপদ সূচক। হিন্দুদের সাংসারিক বা সামাজিক জীবনের সমস্ত প্রকার অনুষ্ঠানেই নারায়ণ পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহার কারণ সমাজ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। নারায়ণ মূর্ত্তির মর্ম্মকথা হইতে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এই শিলাতে ছুঁৎমার্গ ফলানো হইয়াছে। পুরোহিতের স্ত্রী পর্য্যন্ত এই শিলা স্পর্শ করিলে শিলাবাবার জাত যায়। শিলাবাবা নিশ্চয়ই এতটা ব্রহ্মচারী নহেন যে নারী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা ভালভাবেই জানি 'নারায়ণের' সাথী লক্ষ্মী ও তুলসী সদাই বিদ্যমান। পশ্চিম দেশে চামাররাও পুরোহিতের নির্দ্দেশে নারায়ণ পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলার এই ছুঁৎমার্গ অনেকটা গভীর। বাংলায় পৌরোহিত্য বাদীদের বাড়াবাড়িটা একটু বেশী। বিন্ধ্যাচলের মায়ের মূর্ত্তিও সব জাতের লোকেই স্পর্শ করে। কিন্তু বাংলার সর্ব্বত্র ছুঁৎমার্গ ও দক্ষিণা বা দর্শনীর প্রাচুর্য্য।

এবার শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। তোমরা শিবের মূর্ত্তি দেখিয়াছ। একটী অণ্ডাকার পিণ্ড মূর্ত্তি, একটী পীনেট ও একটী ফণীধর মিশ্রণে এই মূর্ত্তি গঠিত। এই অণ্ডাকার পিণ্ড, পীনেট ও ফণীধর বুঝিতে পারিলে শিবমূর্ত্তির রহস্য বুঝিতে পারিবে।

তোমরা শরীর যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে - আমাদের মাথায় অস্থিময় আবরণের মধ্যে দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক ও দুইটী ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে। বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটী মাথার উপরিভাগে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দুইটী মাথার পেছন দিকে অবস্থিত।

যখন যোগশাস্ত্র পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে - মেরুদণ্ডের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য নামক ৫টী চক্রস্থান বিদ্যমান। এবং মস্তিষ্কে আজ্ঞা ও সহস্রার নামক দুইটী মর্ম্মস্থান বা চক্রস্থান বিদ্যমান। এই সব মর্ম্ম কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা যদি তোমরা জানিতে চাও তবে ক্রমবিকাশ অষ্টম অধ্যায় দেখিবে। আমাদের পূর্ব্ব যুগের যোগীরা এই সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ সব মর্ম্মস্থানের প্রত্যেকটী শাখাতে কিরূপ মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান সেই সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া এই সব কেন্দ্রগুলিতে ষট্ চক্রের চিত্রের মত চিত্র খুঁজিতে চেষ্টা করিয়া মূর্খতার চরম নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। চক্রকেন্দ্রগুলিকে ধ্যান করিবার কৌশল এবং মর্ম্মকেন্দ্রগুলির বাস্তব স্থিতি একরূপ নহে। অনাহতে ১২টী শাখা বিশিষ্ট একটি মর্ম্মকেন্দ্র আছে। শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ঐরূপ ১২টি শাখা বিশিষ্ট মর্ম্ম নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা যে ১২টী দল বিশিষ্ট অনাহত পদ্মটির মতন আকার বিশিষ্ট হইবে ইহা মনে করা ভুল। প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন ধ্যান করিবার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ধ্যান কেবল মর্ম্মস্থানের স্থূল জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নহে। উহাতে মনকে একাগ্র ও সমাহিত করিবার

বিজ্ঞানও জড়িত। কাজেই মর্ম্মকেন্দ্রের ধ্যানবিজ্ঞান ও বাস্তব স্থিতিতে ভেদ থাকিবেই। শিব যোগবিদ্যার দেবতা, ইহা হয় তো তোমরা জান। মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্ত মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই যে আত্মজগৎ ইহাই শিব। তোমরা যে শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাও উহা এই আত্মজগতেরই মূর্ত্তি।

মস্তিষ্কের উপরি ভাগস্থিত বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটি একটি মর্ম্মস্থান দ্বারা সংযুক্ত। এই সংযোগকারী মর্ম্মস্থান শিবপিণ্ড। এই শিব পিণ্ডের পেছন দিকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কেন্দ্র বিদ্যমান। এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কেন্দ্র এবং সুষুম্নার শীর্ষস্থান প্রায় একই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে। মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের সামনের দিকে (ভ্রুমধ্য স্থানে) বুদ্ধি কেন্দ্র অবস্থিত। এই শিবপিণ্ডের পেছন দিকে মন কেন্দ্র ও প্রাণ কেন্দ্র অবস্থিত। (মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্রে (১) = মন, (৯) = প্রাণ, (৭) = বুদ্ধি)। শিবপিণ্ডের উপরি ভাগকে (যোগ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট) গুরু পাদুকা বলে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দুইটিকে তোমরা প্রাণ মস্তিষ্ক জানিবে। ইহারা প্রাণকেন্দ্রের কাজের জন্য শক্তিদান করে। প্রাণকেন্দ্রই সুষুম্না শীর্ষ ও প্রাণমস্তিষ্ককে চালাইয়া থাকে।

যোগশাস্ত্র নির্দিষ্ট দ্বিদলই (আজ্ঞা চক্র) বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ। এই শিবপিণ্ডই ঐ দ্বিদলের কর্ণিকা বা মধ্যস্থান। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরি ভাগই সহস্রার। অনেক অনভিজ্ঞকে ছোট মস্তিষ্ক দুইটিকে দ্বিদল বা আজ্ঞাচক্র এবং বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটিকে সহস্রার বলিতে শুনা গিয়াছে। তোমরা অনভিজ্ঞদের কথায় বিভ্রান্ত হইবে না। এই শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া যোগবিদ্যার সমস্ত সাধন ক্রিয়া বিজড়িত রহিয়াছে। ইহাতে ভুল করিলে সমস্ত উপাসনাই পণ্ড হইবে। চিত্রদ্বারা এই সব কথা আরও স্পষ্ট করা হইবে। কারণ হিন্দুধর্ম্মে ইহা খুব মূল্যবান কথা। এই শিবপিণ্ডে আমাদের শরীরস্থিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রপরিচালক কেন্দ্র বিদ্যমান। এই শিবপিণ্ড ধ্যান করিলে সমস্ত শরীরস্থিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্র নীরোগ থাকে।

বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগই আজ্ঞা এবং বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরি ভাগই সহস্রার। বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটির সংযোগ স্থলই শিবপিণ্ড। এই শিবপিণ্ড হইতে মস্তিষ্কের এক শাখা অংশ মেরুদণ্ডের মধ্যভাগ ধরিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মনাড়ীর উর্দ্ধভাগ এবং সহস্রার শিবমূর্ত্তিস্থিত সর্পের ফণাভাগ এবং ব্রহ্মনাড়ীর নিম্ন ভাগ ও মেরুদণ্ডস্থিত ৫টি মর্ম্মকেন্দ্রই শিবমূর্ত্তির সর্পপুচ্ছ। তোমরা চিত্র দেখিয়া সব বুঝিয়া লইবে।

শিবমূর্ত্তি, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার এবং মস্তিষ্ক একই বস্তু। শিবমূর্ত্তির পিণ্ডস্থান = আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থান = বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটির সংযোগ স্থান।

শিবমূর্ত্তির পীনেট = আজ্ঞাচক্র দুইটি দল = বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ।

শিবমূর্ত্তির সর্পফণা = সহস্রার = বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরি ভাগ। এখানেই ব্রহ্মনাড়ীর উপরের অংশ আছে।

শিবমূর্ত্তির সর্পের লেজ = সুষুম্নার শীর্ষ ও মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ী ও সমস্ত মেরুমজ্জা অংশ।

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ উপাসনা করিতে বলা হইয়াছিল। তোমরা যদি শিবপিণ্ড সহ ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান করিয়া উপাসনা কর তবে তোমরা বেশী লাভবান হইবে। ইহা দ্বারা শান্তি, জ্ঞান এবং তেজস্বিতা সবই সহজ হইবে কিন্তু শুধু ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানে তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয় জানিবে।

শিবের পীনেটটি সব সময় দিক্‌যন্ত্রের মত উত্তর দিকে থাকে। শিবপূজা উত্তর দিকে মুখ করিয়া করিতে হয়। পৃথিবীর উত্তর দিকে ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত। ইহাই সত্যস্থান বা ধ্রুবস্থান। মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধিকেন্দ্রের (ভ্রুমধ্য স্থান) সহিত পৃথিবীর উত্তর মুখে একটা চুম্বক ক্রিয়া চলিতেছে। ঐ ক্রিয়ার সহিত আমাদের মন ও বুদ্ধিকেন্দ্রসংযুক্ত ক্রিয়া একরূপতা লাভ করিলে আমাদের জ্ঞান সৃষ্টি রহস্য জানিবার পক্ষে শক্তিশালী হয়। পৃথিবী ও ধ্রুব সংযোগকারী চুম্বক ক্রিয়া এবং মন ও বুদ্ধি সংযুক্ত শক্তি ক্রিয়া এক রেখায় আনিবার জন্য উত্তর মুখে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়।

শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করা হইয়া থাকে। তোমরা শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে আসল কথা সবই জানিলে। এই মূর্ত্তি জীবের আত্ম মূর্ত্তি। বৃক্ষ, কৃমি, পাখী, পশু ও মানবে এই শিবমূর্ত্তি আত্ম মূর্ত্তিরূপে অবস্থিত। সমস্ত প্রকার মন্ত্র উপাসনার লক্ষ্য এই শিবমূর্ত্তি; তোমরা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি" মন্ত্রের নাম শুনিয়াছ।

এই মন্ত্রের লক্ষ্যও এই শিব মূর্ত্তি। বিস্তারিত রাধা তন্ত্রে দেখ। পৌরোহিত্যবাদী ও ভাববাদীরা অকারণ এই জ্ঞান ও শক্তি মূলক উপাসনা লক্ষ্যকে বিকৃত করিয়া সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এই মূর্ত্তি ধ্যান অতীব সহজ ও সুন্দর। এজন্য যোগাভ্যাস কালে এই শিবমূর্ত্তিকে শিবপিণ্ডে বা যে কোন চক্রে মনকে একাগ্র করিবার জন্য ধ্যান করিবার বিধান আছে। তোমরা শিব পূজা করিয়া দেখিও - মনে কিরূপ শান্তি পাওয়া যায়।

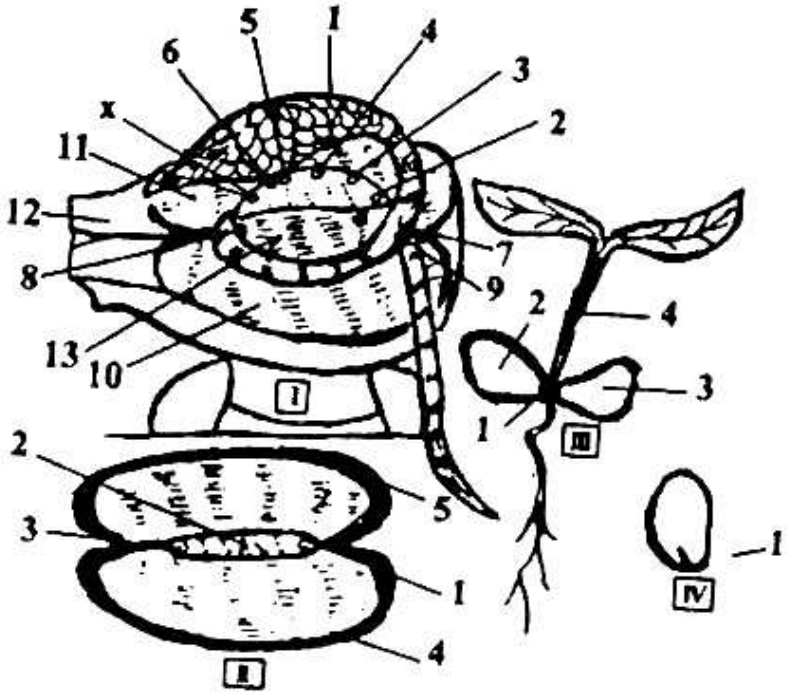

শিবমূর্ত্তি, আজ্ঞা, বীজ ও অঙ্কুর চিত্র

এবার চিত্রদ্বারা শিবমূর্ত্তি বুঝানো যাইতেছে। **I** এই চিত্রটি শিবমূর্ত্তি চিত্র।

১। সর্প ফণায় সহস্রার কেন্দ্র। ২, ৩, ৪, ৫, ৬, X এই সব শিবপিণ্ড স্থানে ৬টি গুরু পাদুকা কেন্দ্র। এই পুস্তকে এই সব কেন্দ্র সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা হইবে না। শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধ অংশই গুরু পাদুকা।

৭। মনের কেন্দ্র।

৮। বুদ্ধিকেন্দ্র।

৯। প্রাণের কেন্দ্র।

১০। আজ্ঞা চক্রের বামদিকের পত্র। ইহা পীনেটের পশ্চিমার্দ্ধ।

১১। পীনেটের পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাই আজ্ঞা চক্রের দক্ষিণ পত্র।

১২। পীনেটের উত্তর দিকের পুচ্ছ।

১৩। শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশ বা আজ্ঞা অংশ। ইহাই আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকা। শিবপিণ্ডের ঊর্দ্ধ অংশই গুরুপাদুকা।

II ইহা একটি আজ্ঞা-চক্র চিত্র।

১। মনের কেন্দ্র।

২। আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকা। ইহাই শিবপিণ্ডের আজ্ঞাঅংশ।

৩। বুদ্ধি কেন্দ্র।

৪। আজ্ঞা চক্রের বাম পত্র।

৫। আজ্ঞা চক্রের দক্ষিণ পত্র।

III ইহা একটি অঙ্কুর চিত্র। বীজ পুঁতিলে প্রথমটায় এইরূপ চারা উদ্‌গত হয়।

১। চারার মূল ভাগ, উর্দ্ধ ভাগ এবং বীজের দ্বিদল সংযোগ স্থল। এই চিত্রের সহিত শিবমূর্ত্তিটির তুলনা কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে শিবমূর্ত্তি কেবল আমাদের আত্ম-মূর্ত্তি নহে। ইহা বৃক্ষাদিরও আত্মমূর্ত্তি। এই স্থানেই বৃক্ষের প্রাণকেন্দ্র বিদ্যমান। আমাদের প্রাণও ৯ (**I** চিত্র) চিহ্নিত স্থানে আছে।

২, ৩ চারার এই দুইটি অংশের সহিত আজ্ঞা চিত্রের ৪, ৫ অংশ এবং শিবমূর্ত্তির ১০, ১১ অংশ মিলাও।

৪ চিত্রের এই অংশ এবং চারার মূলভাগই শিব মূর্ত্তিতে সর্প।

IV ইহা বীজ চিত্র। এইরূপ বীজ মাটি ও জলের আশ্রয় পাইলে **III** চিত্রের মত চারা বাহির হয়।

১ বীজে ইহাই অঙ্কুর। এই অঙ্কুরই ওঁ কার। ওঁ কার = ব্রহ্মনাড়ী = ওঁ = ব্যাহৃতি = শিবমূর্ত্তির সর্প = আত্মা।

এখানে আরও একটি চিত্র দ্বারা মস্তিষ্কে সহস্রার আজ্ঞা ও শিবপিণ্ড বুঝান যাইতেছে।

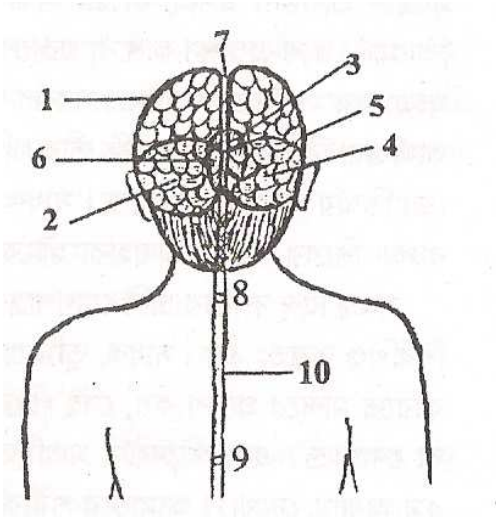

মস্তিষ্কে আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র

চিত্র পরিচয়

১। বাম মস্তিষ্কে সহস্রার।

৫। দক্ষিণ মস্তিষ্কে সহস্রার। মস্তিষ্কের উপরি ভাগই সহস্রার। পাগড়ীর আকারে সহস্রার অংশ দেখানো হইয়াছে।

২। বাম মস্তিষ্কে আজ্ঞার বাম পত্র। বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগই আজ্ঞা। আড়াআড়ি ভাবে অঙ্কিত রেখাদ্বারা সহস্রার এর নিম্ন অংশে ইহার অবস্থান দেখানো হইয়াছে।

৪। দক্ষিণ মস্তিষ্কের আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণ পত্র।

৬। ৩। উভয় মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত সহস্রার গর্ভস্থিত এবং আজ্ঞা মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। ৩ শিবপিণ্ডে গুরুপাদুকা। ৬ চক্রের ওঁ বা শিবপিণ্ডে আজ্ঞা অংশ। ছোট ছোট দাঁড়া রেখা দ্বারা সহস্রার এর গর্ভে এই শিবপিণ্ড অংশ দেখানো হইয়াছে।

৭। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ফাঁকা স্থান। এই ফাঁকা স্থানটি শিব পিণ্ড পর্য্যন্ত অবস্থিত। তোমরা আখরোট দেখিলে মস্তিষ্কের আকারের একটা সঠিক নমুনা বুঝিতে পারিবে।

৮। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্র।

৯। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত অনাহত কেন্দ্র।

১০। মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুষুম্না মার্গ। এই মার্গেই ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত।

এবার তোমাদিগকে মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক চিত্রের সাহায্যে আজ্ঞা, শিবপিণ্ড, সহস্রার বুঝানো যাইতেছে।

I আমাদের মস্তিষ্কটি উল্টাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখায় সেই চিত্র।

১। শিবপিণ্ডের সমসূত্র স্থান।

৫। বুদ্ধিস্থানের সমসূত্র স্থান।

৬। প্রাণ কেন্দ্রের সমসূত্র স্থান।

৩। দক্ষিণ মস্তিষ্ক

৭। মস্তিষ্কের কপালের দিক।

৮। ছোট মস্তিষ্ক।

৯। ছোট মস্তিষ্ক।

II আমাদের মস্তিষ্কটি যদি উভয় কর্ণের সমসূত্রভাবে কাটা যায় তবে উহার আকার এই চিত্রের মত হয়।

১। শিবপিণ্ড।

৩। উভয় মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী ফাঁকাস্থান। এই ফাঁকাস্থানের মধ্যে ১১ ও ১২ অংশ এবং শিবপিণ্ড মিলাইয়া আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্র অংশকে দাঁড়ারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। দাঁড়া রেখা ভিন্ন সমস্ত রুজুরেখা সহস্রার এবং সহস্রার গর্ভস্থান জানিবে।

৬। এই অংশই গুরুপাদুকা। ইহাই সহস্রার গর্ভাংশ।

III এই চিত্র মস্তিষ্কের ভ্রুমধ্য ও শিখার সমসূত্রে কাটিয়া দুই ভাগ করিলে যেরূপ হয়, উহার চিত্র।

১। মনের কেন্দ্র।

২। সূর্য্য কেন্দ্র।

৩। বিষ্ণু কেন্দ্র।

৪। শিব কেন্দ্র।

৫। উন্নত শিবকেন্দ্র।

৭। বুদ্ধি কেন্দ্র বা গণেশ কেন্দ্র।

৮। মেরুদণ্ড গত ব্রহ্মনাড়ী অংশ, বা সুষুম্না অংশ।

১০। মস্তিষ্ক স্থিত ব্রহ্মনাড়ী।

১১। ছোট মস্তিষ্ক। ছোট মস্তিষ্ককে তোমরা আজ্ঞাচক্রের অংশ ও প্রাণ মস্তিষ্ক জানিবে।

১২। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড।

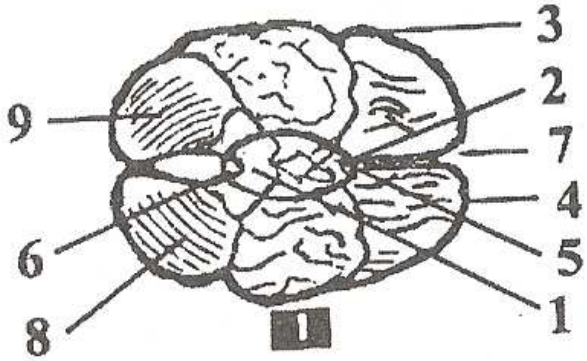

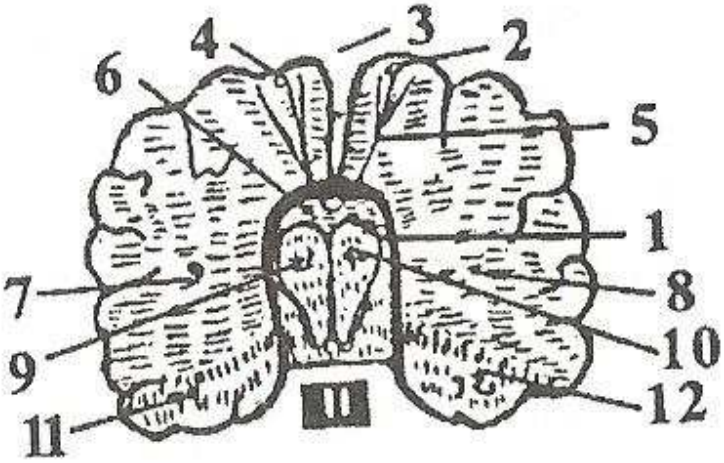

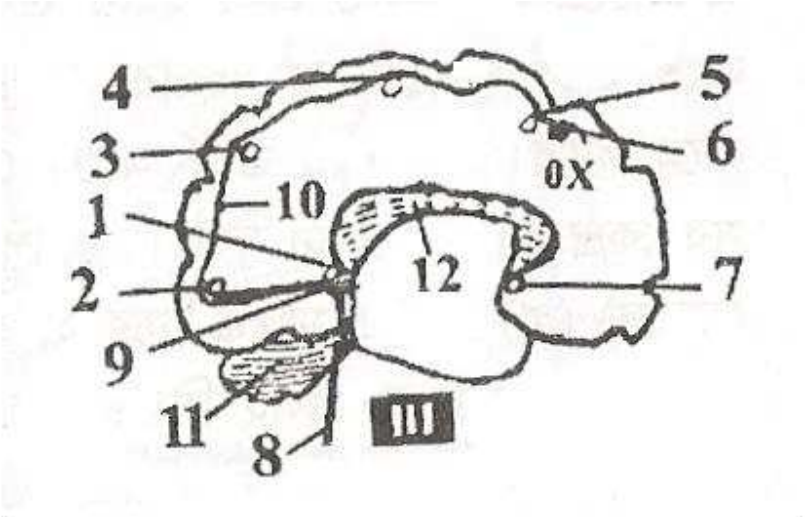

আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক সুষুম্না সম্বন্ধ চিত্র

লিঙ্গমূর্ত্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ

লিঙ্গমূর্ত্তি সম্বন্ধে তোমরা যাহাতে একেবারে সন্দেহহীন হইতে পার এজন্য শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। পৌরোহিত্যবাদী ও মূর্ত্তিখণ্ডনকারী সম্প্রদায়ের মিথ্যা প্রচারে অনেক ভক্ত সাধককে আমরা বিভ্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। কাজেই শাস্ত্রের প্রমাণ দেখ:-

১। লিঙ্গনানাং চ ক্রমং বক্ষে যথা বচ্ছৃণুত দ্বিজাঃ।
তদেব লিঙ্গং প্রথমং প্রণবং সর্ব্বকালিকম্।
সূক্ষ্ম প্রণব-রূপোহি সূক্ষ্মরূপং তু নিষ্কলম্।
স্থূললিঙ্গং হি সকলং তৎ পঞ্চাক্ষর মুচ্যতে।
তয়ো পূজা তপঃ প্রোক্তং সাক্ষা ন্মোক্ষপ্রদ উভে॥
পুরুষ প্রকৃতি ভূতানি লিঙ্গানি সুবহূনি চ।
তানি বিস্তরশো বক্তং শিবো বেত্তি ন চাপরঃ॥

শিব পুরাণম্

হে দ্বিজগণ (দীক্ষিতগণ) আমি লিঙ্গের ক্রম বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। ইঁহাদের মধ্যে 'ওঁ'ই প্রথম লিঙ্গ। এই ওঁই ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালের স্বরূপ। প্রণব রূপ লিঙ্গের আবার সূক্ষ্মরূপ আছে, সেই সূক্ষ্মরূপই 'নিষ্কল ব্রহ্ম'। 'সকল' অর্থাৎ সমষ্টি বিশ্বকে স্থূল লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। ইহা শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের সমষ্টি। এই উভয় প্রকার লিঙ্গের পূজাই তপস্যা। এই লিঙ্গ পূজা সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রদান কারী। পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং অনেক প্রকারের ভূততত্ত্ব, (সাংখ্য দর্শন দেখ) সবই লিঙ্গেরই বিভিন্ন রূপ। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভিন্ন অন্যে ইঁহাদিগকে জানিতে পারেন না।

২। সাজ্ঞানামাম্বুজং বদ্ধিমলকর সদৃশং ধ্যান ধাম প্রকাশং।
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিত বপুর্নেত্র পত্র সুশুভ্রং॥
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষটকং দধানাং।
বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপ বটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা॥
এতদ্ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং।
যোনৌ তৎ কর্নিকায়া মিতর শিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশং॥

ষট চক্রনিরূপণম্ ৩৪। ৩৫॥

ভ্রুযুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটী দ্বিদল চক্র আছে। উহা চন্দ্রসম শুভ্রবর্ণ। যোগীদিগের ধ্যানস্থান স্বরূপ, অতীব শুভ্র। ইহার দলদ্বয়ে হক্ষ দুইটি বর্ণ শোভা পাইতেছে। এই আজ্ঞার মধ্যে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, জপমালা-ধারিণী চতুর্ভুজা বিমল চিত্তা ষড়াননা 'হাকিনী' শক্তি, অধিষ্ঠিতা আছেন। এই পদ্মের অন্তর কর্ণিকা ভাগে সূক্ষ্মরূপী মন প্রসিদ্ধ আছে। (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১ কেন্দ্র)। এবং যোনীর আকার বিশিষ্ট (দুইটি দলের মধ্যস্থিত) কর্ণিকার মধ্যে ইতর নামক শিবলিঙ্গ প্রকাশমান রহিয়াছেন। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত এই শিবলিঙ্গ সত্যই যোনীর আকার বিশিষ্ট গহ্বরে অবস্থিত। (দেখ মস্তিষ্কে সহস্রার, আজ্ঞা ও শিবপিণ্ড নির্দ্দেশক চিত্রে ৭ স্থান। আজ্ঞা সহস্রার ও শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধ চিত্রের II চিত্রে ৩ স্থান দেখ)।

৩। আরাধয়ামি মণি সন্নিভ মাত্মলিঙ্গং
মায়াপুরী হৃদয় পঙ্কজং সন্নিবিষ্টং।

শ্রদ্ধানদী বিমল-চিত্ত জলাবগাহং
নিত্য সমাধি কুসুমৈর পুনর্ভবায়॥ হংস ধ্যান।

আমি মণির মত জ্যোতি বিশিষ্ট আত্মরূপ লিঙ্গকে আরাধনা করি। তিনি মায়াপুরী রূপ সহস্রার কমলের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট আছেন। শ্রদ্ধারূপা নদীতে ও জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করিতেছি, সমাধি রূপ কুসুমে পূজা করিতেছি। (শ্রদ্ধাজ্ঞান ইত্যাদি নাড়ী শিবপিণ্ডে আছে, ক্রমবিকাশ ৮ম অধ্যায় দেখ)। তাহাতে আর পুনরাবৃত্তি হইবে না (অর্থাৎ শেষ সমাধি লাভ করিবার যোগানুষ্ঠান করিতেছি)।

৪। আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবীতস্য পীঠকা।
আলয় সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ লিঙ্গ পুরাণ॥

আকাশই (আ = ব্যাপ্ত। কাশ = জ্যোতি। অর্থাৎ যিনি ব্যাপক এবং যিনি জ্ঞানময় তিনিই লিঙ্গ) লিঙ্গ। পৃথিবী (অর্থাৎ মূলাধার চক্র) তাঁহার পীঠ স্বরূপ। ইহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করেন এবং সমস্ত দেবতা ইহাতে লয় প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম লিঙ্গ (অর্থাৎ লিঙ্গ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই লিঙ্গ)।

৫। আলয় লিঙ্গমিত্যাহু র্ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।
যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদাইবা॥

তিনি সর্বভূতের আলয় বলিয়াই তাঁহার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ মূর্ত্তিকে লিঙ্গ মনে করিও না। এই লিঙ্গে বা (লীনং গচ্ছতি ইতি) ব্রহ্মে সমস্ত সৃষ্টি জলের বুদ্বুদের মত বিলীন প্রাপ্ত হয়।

৬। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ (বেদান্ত সূত্রম্)
আকাশ তাঁহার (ব্রহ্মের) লিঙ্গ।

৭। লিঙ্গাচ্চ॥ (বেদান্ত সূত্রম্)॥
বিলীন করিবার অভ্যাস বা সমাধিই লিঙ্গ।

৮। স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে॥
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।
ক্ষন্তব্যং মে অপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
শিবাপরাধ স্তোত্রম্।

যাহা (যে লিঙ্গ) প্রণবময় এবং বায়ুময় (জীবনী শক্তিময়) রূপে (সুষুম্না নামক) সূক্ষ্মমার্গে (মূলাধার পদ্মে) কুণ্ডলিত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়, যাহা জ্যোতিঃ স্বরূপ (জ্ঞানময়), যাহা পরম ব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবের মধ্যে (ব্রহ্মনাড়ী ও কুণ্ডলিনী রূপে) অবস্থান করিতেছেন; যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত, সেই 'লিঙ্গ'কে স্মরণ করি নাই। হে অনন্ত মঙ্গলময় শিব! হে সমতার স্বরূপ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

৯। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো-নমঃ॥ সামবেদ।

তিনি (পরম ব্রহ্ম) অবিনাশী, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল পুরূষ (অগ্নিরূপ পুরুষ), তিনি উর্দ্ধ লিঙ্গ (অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত), তিনি অরূপ, তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহাকে বার বার প্রণাম।

১০। তোমরা লিঙ্গ মূর্ত্তি মাত্রই মস্তিষ্কের মূর্ত্তি জানিবে। ঠিক ঠিক মস্তিষ্কের আকার বিশিষ্ট লিঙ্গ মূর্ত্তি খুব কম দেখা যায়। কাশীতে গোদৌলিয়া হইতে বুলানালা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার ধারে যাইতে ডান দিকে (হাউস কাটরার নিকটে) এক সর্ব্বজন পূজ্য প্রাচীন লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী একটু গর্ত্তের মধ্যে খোলা স্থানে অবস্থিত (সংলগ্ন বাড়ীর নম্বর মনে নাই)। এই মূর্ত্তিটি ঠিক মস্তিষ্কের আকার বিশিষ্ট।

শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আরও বহু তথ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। মূর্ত্তি নিন্দুকদের মধ্যে খৃষ্টবাদী ও ইসলামীয়ারাই বেশী প্রসিদ্ধ। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ প্রাচীন খ্রীষ্টানদের মন্দিরে শিব লিঙ্গ পূজিত হইত। মেডাম ব্লাভস্কি লিখিত 'ইসিস্ আন্‌ভেইল' নামক পুস্তকে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্খ খৃষ্টানরা পরবর্ত্তী কালে কুৎসিত কিছু মনে করিয়া ঐ লিঙ্গ মূর্ত্তি ফেলিয়া দিয়াছে এবং ক্রূশের স্থাপনা করিয়াছে। ২টী প্রস্তরে সেই লিঙ্গমূর্ত্তি গঠিত ছিল। নীচের পাথরের নাম ছিল স্ত্রী পাথর বা 'অ' এবং উপরের পাথরের নাম ছিল 'উম্' বা পুং পাথর। তোমরা দেখিতেছ অ + 'উম্' = 'ওঁ' হইল। এই 'ওঁ'ই শব্দ ব্রহ্ম। বাইবেলে এই 'শব্দ ব্রহ্মকে' বা শিব লিঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া একটী বাণী আছে - In the beginning there was word. That word was God. That word was with God.* (দেখ বাইবেল, যোহ্ন বাক্য)। (আরম্ভে শব্দ ছিল। সেই শব্দ ঈশ্বর ছিল। সেই শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল।) কুরান ও মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় মক্কাতে ৩৬০টী বুত ছিল। মুসলমানেরা সেই সব-গুলি মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া মাত্র একটীকে রক্ষা করে। আজ কাল ঐ শিব মন্দিরই 'কাবা'র মন্দির নামে খ্যাত। সেখানে এই শিলামূর্ত্তির নিকটে মুসলমানগণ বলিদান পূজাদি করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে এই মন্দিরের উল্লেখ আছে। মহম্মদ এই প্রাচীন হিন্দু তীর্থ-মন্দিরে অমুসলমানগণের পূজা ও প্রবেশাধিকার বাতিল করেন। কুরানে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (সূরাহ্ বারায়ত। আঃ ১৭)

খৃষ্টবাদী ও মুসলমানগণ সেই 'প্রণব লিঙ্গ' বা 'শব্দ ব্রহ্ম' দার্শনিকতা হইতে কোথায় সরিয়া গিয়াছে উহা যদি তোমরা কখনও বাইবেল ও কুরান আলোচনা কর তবে বুঝিতে পারিবে। কুরান বাইবেল হইতেই 'গড্'এর দার্শনিকতার হুবহু নকল করিয়াছে এবং বেদ প্রতিপাদ্য ঈশ্বর ও ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। যদি বেদের দার্শনিকতা তাঁহারা মানেন তবে কুরাণের মতে তাঁহারা কাফের হইবেন। আবার কুরানের দার্শনিকতাকে যদি ইঁহারা বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবুও তাঁহারা কাফের। আজকাল অনেক মুসলমান আল্লাহ্ মিঞাকে 'ব্রহ্ম' করিবার চেষ্টা করিয়া কাফের সাজিতেছে দেখা যায়।

আকাশের কোন কোণে গড্ বা আল্লাহ্ অবস্থান করেন। তিনি কেয়ামতের সময় সব মৃত আত্মার বিচার করিয়া কাহারও জন্য অনন্ত দুজক এবং কাহারও জন্য অনন্ত কালের জন্য বহিস্তের ব্যবস্থা করিবেন।

খৃষ্টান পাদরীরা রাস্তায় ঘাটে, তাহারা মূর্ত্তি পূজা করে না বলিয়া ভারী বাহাদুরী দেখায়। কিন্তু তাহারা যাঁহাকে ঈশ্বর বলে উহা আমাদের পুরাণ কল্পিত যমরাজ তুল্য বা প্রেতেশ্বর সমতুল্য নহে। খৃষ্টানদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্বর্গে সাত শিং ও সাত নেত্র ওয়ালা এক বিকট মূর্ত্তিধারী ঈশ্বরের কথা আছে। ইসলামীরাও মনে করে তাহারা মূর্ত্তি পূজা করে না। কিন্তু মূর্ত্তি পূজা যে তাহারা করে উহার প্রমাণ মক্কাতে বিদ্যমান। কুরানেও ঐ কাবার দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতে বলা হইয়াছে। সূরা ২ আঃ ১৪৪॥ আমরা মূর্ত্তি পূজা করি, কিন্তু উহা নির্গুণ ব্রহ্মেরই

---

* প্রকাশকের নিবেদন - King James Version-এ John 1:1 : "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

উপাসনা। যাহারা ঐ তত্ত্ব পায় না তাহারা সকলেই প্রেত জগতে যায় অর্থাৎ যমের বাড়ী যায়। প্রেতের বিচার যমের কাজ। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ঐ সব কার্য্য হইতে পরপারে। তোমরা গণেশ, শিবাদি সগুণ ব্রহ্মের এবং বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, কিন্তু ঈশ্বরমূর্ত্তি বা ব্রহ্ম মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই। কুরানের আল্লাহ মিঞা যে মানুষের মত আকার বিশিষ্ট একথা কুরানে আছে। কুরানে স্পষ্ট বলা আছে যে তিনি আদমের মূর্ত্তি নিজের মতন করিয়া গড়িয়াছেন। (দেখ সুরাঃ 'আরাজ'। আঃ ১১)।

ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের দার্শনিকতা খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম হইতে অন্যরূপ। তিনি ব্যাপক ও নির্লিপ্ত, বিচার বা অবিচার রূপ কর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি আমাদের শরীরস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থান করিয়া কিরূপ নির্লিপ্ত সে সম্বন্ধে তোমরা উপনিষদ পাঠ করিয়া জানিবে। গীতা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা --

১। সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্॥ ৫-১৩॥

বশী (আত্মা) এই নবদ্বাররূপ শরীরে মন দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুখে অবস্থান করেন (মন যোগদ্বারা বৃত্তিহীন হইলে কোন কর্ম্মেই মনের লিপ্ততা থাকে না)। তিনি করেনও না করানও না।

২। ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫-১৪॥

প্রভু (ঈশ্বর, আত্মা, বা ব্রহ্ম) কাহারও জন্য কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সৃজন করেন না। এই সব স্বাভাবিক নিয়মে প্রবর্ত্তিত হয়।

৩। ন দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫-১৫॥

বিভুঃ (ব্যাপক আত্মা) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। মানুষের মন অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইবার দরুণ মোহিত হয় (অর্থাৎ মূর্খতা বর্ব্বরতা করিয়া থাকে)।

৪। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষাং আদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ৫-১৬॥

যাঁহাদের অজ্ঞান আত্মজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের জ্ঞান সূর্য্যের মত প্রকাশিত হয়। (তোমরা দেখিতেছ ঈশ্বরকে আকাশে কল্পনা করা ও তাঁহাকে মৃতের বিচারক মনে করা হিন্দু শাস্ত্র মতে অজ্ঞানতা মাত্র।)

কর্ম্ম ধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম, ও জ্ঞান ধর্ম্ম তিনটী ব্যাপারেই খৃষ্টবাদী ও মুসলমানগণ আসল বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তোমরা বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-ধর্ম্মের অনুশীলনকে জীবনের অত্যন্ত পবিত্র ও প্রয়োজনীয় বস্তু মনে করিবে এবং বাইবেল ও কুরানেরও আলোচনা রাখিবে। প্রতিবেশীর কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের যথেষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ীদের মিথ্যা কথায় বিভ্রান্ত হইও না।

একদিকে ক্রমবিকাশবাদ বা জন্মান্তরবাদ অন্যদিকে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাদ, একদিকে ব্যাপক ঈশ্বরত্ব এবং অন্যদিকে আকাশের কোণে বাড়ী ঘর করিয়া বাসকারী ঈশ্বরত্ব; এইরূপ দুইটা বিরুদ্ধ কথা এক বস্তু হইতে পারে না। যদি ইহার একটা সত্য হয় তবে অন্যটা নিশ্চয়ই মিথ্যা। একদিকে লক্ষ লক্ষ বৎসরের

যোগী ঋষিদের দ্বারা পরীক্ষা করা সত্য, অন্যদিকে কল্পনা বিলাসীর কল্পনা। যাঁহারা ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া বেড়ান তাঁহাদিগকে আমরা কুরান পড়িতে অনুরোধ করি।

খৃষ্টান পাদরীগণকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে হিন্দু ধর্ম্ম আক্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে দেখা যায়। সে সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হইবে। যথা -

পাদরী - আমি যদি তোমার শিব ঠাকুরকে এই লাঠী দ্বারা খোঁচা মারি সে কি করিতে পারে?

উত্তর - আমি যদি মিঃ গড্‌কে 'হারামজাদা' বলি সে আমার কি করিতে পারে?

পাদরী - গড্ তোমাকে পরলোকে নরকে ফেলিবেন।

উত্তর - শিব তোমাকে পরকালে তাঁহার ত্রিশূল দ্বারা খোঁচাইতে থাকিবেন এবং তোমাকে কুষ্ঠ রোগী করিয়া আমাদের সামনেই একটা ঘৃণিত পাপী করিয়া জন্ম দিবেন।

তোমরা মূর্খদের কথায় আত্মবিশ্বাস হারাইবে না। 'মূর্ত্তি' যোগবিদ্যা ও আত্মজ্ঞান শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবলম্বন। যেমন মানচিত্র না হইলে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তির অবলম্বন না করিলে উন্নত জ্ঞানভূমির দার্শনিকতাকে ব্যাখ্যা করা সহজ হয় না। তোমরা পত্রিকায় কার্টুন দেখিয়া থাকিবে। ছবিদ্বারা সংবাদ প্রচার যত সহজ, সংবাদের বিবরণ লিখিয়া সংবাদ প্রচার তত সহজ হয় না।

তোমরা ব্রহ্ম স্তোত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান করিবে। অথবা পূজানুষ্ঠানের অন্তে গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিবে; কারণ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের কয়েকটি সিড়ী মাত্র।

সগুণ ব্রহ্মোপাসনার এই সব স্তর গুলি সবই ব্যাপক। আমাদের মন একদিনে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত হয় না। স্তরে স্তরে জ্ঞানের ভূমিগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই সব ভূমিগুলিই সগুণ ব্রহ্ম নামে খ্যাত। সগুণ ব্রহ্মের স্তুতি সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক দেওয়া যাইতেছে। তোমরা সুবিধামত ঐগুলি আয়ত্ত করিবে এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মস্তোত্ররূপে যে কোন মন্দিরে বা পূজাদিতে গাইতে পারিবে।

১। ওঁ শান্তাকারং ভুজঙ্গ শয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগীভির্ধ্যানগম্যং
বন্দেবিষ্ণুং ভবভয়হরণং সর্ব্বে লোকৈক নাথং॥

যিনি শান্ত আকার বিশিষ্ট (অন্তঃকরণ শান্ত হইলে যে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় সেই তত্ত্বই শান্ত আকার), সর্প (ব্রহ্মনাড়ী) যাঁহার বিছানা (অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ীতে যিনি ব্যাপ্ত), যাঁহার নাভীতে পদ্ম রহিয়াছে (যোগের ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মনকে নাভি স্থানে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে বিষ্ণু স্তরের অনুভূতি পাওয়া যায়), যিনি মেঘবর্ণ (মনস্থির হইলে মেঘের মত রং বিশিষ্ট ব্যাপক অনুভূতি ফোটে), মঙ্গলই যাঁহার অঙ্গ (যত প্রকার মঙ্গল পূর্ণ ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে সেই সবই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ), যিনি ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর (বিষ্ণুস্তরের সঞ্চিত কর্ম্মগুলি ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গলপূর্ণ ঘটনারূপে ফলোন্মুখ হইতে থাকে), যিনি স্নেহময় দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখেন, যোগীজন ধ্যানদ্বারা যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, যিনি ব্যাপক ঈশ্বর, যিনি জগতের সব ভয় নাশ করেন এবং সমস্ত জগতের একমাত্র ঈশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করি।

২। ওঁ বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎ কারণম্।
বন্দে পন্নগ ভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্য শশাঙ্ক বহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং।
বন্দে ভক্ত জনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিব শঙ্করং॥

যিনি ওঁকার রূপী স্বামী বা ঈশ্বর (উমা = উ+ম্+অ+অ = ওঁ) তাঁহাকে প্রণাম, যিনি বিশ্ব জগতের বীজ স্বরূপ এবং বীরদের গুরুদেব তাঁহাকে প্রণাম। যিনি মৃগকে (কামের বেগকে) ধারণ করিয়া আছেন (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মচারী) এবং যাঁহারা সম্যক্ অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের যিনি ঈশ্বর তাঁহাকে প্রণাম (পাণিনি দ্রঃ, পশু = সম্যক)। সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি যাঁহার নেত্র স্বরূপ এবং যিনি জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানীদের প্রিয় তাঁহাকে প্রণাম। যিনি ভক্তজনের আশ্রয় ও স্নেহশীল তাঁহাকে প্রণাম। যিনি মঙ্গলময় ও মঙ্গল করেন তাঁহাকে প্রণাম।

৩। ওঁ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে॥
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে॥
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।
ক্ষন্তব্যং মে অপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।

ইহার অর্থ মূর্ত্তি বিজ্ঞান অংশে দেখ।

৪। শুক্লাং ব্রহ্ম-বিচার-সার-পরমা মাদ্যাং জগদ্ব্যাপিনীম্।
বীণা পুস্তক ধারিণীমভয়দাং জাড্যান্ধকারাপহাম্॥
হস্তে স্ফটিক মালিকাং বিদধতিং পদ্মাসনে সংস্থিতাম্।
বন্দে তাং পরমেশ্বরীং ভগবতীং বুদ্ধিপ্রদাং সারদাং।

যিনি শুভ্ররূপা, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠবিগ্রহ, যিনি শ্রেষ্ঠা, যিনি আদ্যাশক্তি রূপিনী, যিনি বিশ্বব্যাপিনী, যিনি বীণা ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন (অর্থাৎ বীণা যন্ত্র ও গ্রন্থদ্বারা যাঁহার জ্ঞানময়ীরূপ জগতে প্রচারিত হয়), যিনি অভয়দান করেন (অর্থাৎ জ্ঞানীর ভয় থাকে না), জড়তা (মূর্খতা) রূপ অন্ধকার যিনি নাশ করেন, যাঁহার হস্তে স্ফটিকমালা (অর্থাৎ যিনি নিজের কর বা কর্ম্ম শক্তি দ্বারা জ্ঞানই প্রতিষ্ঠা করেন) ধৃত আছে, যিনি পদ্মাসনে সংস্থিত আছেন (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যস্থিত মস্তিষ্ক মর্ম্মকেন্দ্রে অবস্থান করেন), সেই জ্ঞানরূপা জ্ঞানদায়িনী ভগবতী ও শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীকে প্রণাম করি।

৫। যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা যা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা।
যা বীণা-বর-দণ্ড-মণ্ডিত-করা যা শ্বেত-পদ্মাসনা॥
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্করঃ প্রভৃতিভি র্দৈবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাংপাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষ জাড্যাপহা॥

যিনি কুন্দ (পুষ্প), চন্দ্রমা ও বরফ পর্ব্বতমালার মত ধবলা, যিনি শুভ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃতা (অর্থাৎ শান্তির আবরণ ভেদ হইলে জ্ঞান লাভ হয়) যিনি বীণা, বর, দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্বেত পদ্মে অবস্থিত আছেন (মস্তিষ্কের মর্ম্মস্থলকে শ্বেত পদ্ম বলে), যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা সদা পূজনীয়া (অর্থাৎ মনের স্তর, বিষ্ণুস্তর ও শিবস্তরের উপরে উন্নত শিবের স্তর বা জ্ঞানের স্তর অবস্থিত), নিঃশেষে অজ্ঞানতা নাশকারী ভগবতী সরস্বতী আমাকে পবিত্র করুন। (বীণা = ধ্বনি বিজ্ঞানের যন্ত্র, ধ্বনিই জ্ঞান বিভূতি। বর = জ্ঞানী বা গুরুর আশীর্ব্বাদই বর বা স্নেহ। গুরুর স্নেহ দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড = ব্রহ্মচর্য্য বেশ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়)।

অবতার উপাসনা

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাদি পর্য্যন্ত এবং সাধারণ মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে একই আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু সকলের জ্ঞান সমান নহে। কেহ কম জ্ঞানী এবং কেহ বেশী জ্ঞানী। জ্ঞানের এই ভাগকে হিন্দু শাস্ত্রে 'কলা' বলে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলার মহাত্মা ছিলেন। এই কলাকে 'পূর্ণ কলা' বলে। কোন্ জীবে কোন্ কলার জ্ঞান বিদ্যমান সেই সম্বন্ধে তোমাদের জানা প্রয়োজন। জীবের জ্ঞান যখন অষ্টম কলা অতিক্রম করিয়া নবম কলায় আসিয়া দাঁড়ায় বা ৯ম হইতে ঊর্দ্ধ কলায় বিকশিত হয় তখন উহাকে অবতার কলা বলা হয়। প্রত্যেক জীবেরই কর্ম্মে চরিত্রে ও জ্ঞানে নিজ নিজ বিকাশ অনুরূপ চরিত্র প্রতিভাত হয়। এই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে শিক্ষা করিলে তোমরা যে কোন মানুষকে চিনিতে পারিবে এবং নিজের চরিত্র সুন্দর ও কর্ম্মময় করিতে পারিবে।

অনেকের ধারণা ঈশ্বরের কোথাও বাড়ীঘর আছে। সেইখান হইতে তিনি অবতার বা মহাপুরুষ পাঠাইয়া থাকেন। এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। তোমরা জানিয়া রাখিবে ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যাপক। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের যত বেশী ও সঠিক জ্ঞান হয় আমরা ততই খাঁটী ও শ্রেষ্ঠ মানুষ হইয়া থাকি। আমরা যত উচ্চ স্তরের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি লাভ করি আমরা ততই উচ্চস্তরের মহাপুরুষ হইয়া থাকি। উচ্চস্তরের জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তিই মানুষকে মহাপুরুষে বা অবতারে পরিণত করে। অবতার চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা কোন না কোন প্রকার আসুরিকতার মূল উচ্ছেদ করিয়া যান। ইদানীং আমাদের দেশের অনেক লোকেরই অবতার সম্বন্ধে ধারণা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ষষ্ঠ কলার মহাপুরুষগণকেও অবতার মনে করেন। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সমাজে হইবার দরুণ আমাদের সমাজ বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তোমরা অবতার কলা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবে।

১ কলায় উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি। ২ স্বেদজ। ৩ অণ্ডজ। ৪ জরায়ুজ। চারের সামান্য অধিক হইলেই মানুষরূপে জন্ম হয়। এ সম্বন্ধে 'ক্রম বিকাশ', 'শক্তিবাদ', 'শক্তিশালী সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

৪ কলার সাধারণ মানুষ। ইহারা সরল ধর্ম্মে বিশ্বাসী, প্রেত উপাসক, মোটেই বুদ্ধিমান নহে। মুটে মজুর, পেয়াদা, দপ্তরী, চাপ্রাসী, পূজারী, রাঁধুনী, চাওয়ালা, সাধারণ হোটেল ওয়ালা, মেথর, প্রেস কম্পোজিটার, সহিস, গাড়োয়ান প্রভৃতি এই কলার বিকাশ। ইহাদিগকে নিম্ন স্তরের শিব-বিকাশ জানিবে।

৫ কলার বিকাশে গণেশ লক্ষণযুক্ত মানুষ। বিশেষ লক্ষণ 'কঠোর প্রকৃতি'। অন্যায় বিরোধী, ত্যাগী প্রকৃতি, যুদ্ধ প্রিয়, উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন, একটু এক-গুঁয়ে, চরিত্রবান, স্বদেশ প্রেমী, কষ্ট সহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়ভাষী, সাহসী, জড় বিজ্ঞানে নিষ্ঠা সম্পন্ন, অন্ধবিশ্বাস বিরোধী। উন্নত চরিত্র আয়ত্ত করিতে হইলে ৫ কলার লক্ষণ খুব সহায়ক হয়। বিচারক, ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, যুবকদের নেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এস্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যাইবে।

৬ কলার বিকাশে সূর্য্য লক্ষণযুক্ত মানুষ। বিশেষ লক্ষণ 'কোমল প্রকৃতি'। মেয়েলী প্রকৃতি, কৃপণ স্বভাব, হিসাবী, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী, ভাবপ্রবণ। দুইটা বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে পড়িলে সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াও উভয় দিকের প্রিয় হইতে চেষ্টা করেন। আদর্শের দিকে ঝোঁক বেশী, ফলে লক্ষ্য গুলাইয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে এ কলার বিকাশ থাকিলে দানশীলা হন। ইহাকে জগৎগুরু কলা বলে। শিক্ষক, ধর্ম্মপ্রচারক, উকিল, ডাক্তার, রাজদূত, বক্তা, সংবাদপত্র সেবী, পুরোহিত, গায়ক, কবি, ভাবুক, ভাববাদী, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদী, সেবাশ্রমী, অহিংসাবাদী, কেরাণী ও জ্যোতিষিগণের মধ্যে এ স্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যায়। এ স্তরের ভালো বিকশিতগণই জগৎগুরুর স্থান পাইয়া থাকেন।

৭ কলার বিকাশকে বিষ্ণুস্তরের বিকাশ বলে। বিশেষ লক্ষণ 'গম্ভীর প্রকৃতি'। সমাজশাসক ও সমাজনেতা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। সন্দিগ্ধ প্রকৃতি কিন্তু উহা কথায় ও ব্যবহারে বুঝা যায় না। চক্রী। মনের ভাব, কথা ও কার্য্য একই প্রকারের হয় না। সংগঠন করিবার পক্ষে উপযুক্ত।

৭ কলা হইতে আসুরিক বিকাশ হইয়া থাকে। দৈবী বিকাশসম্পন্ন সাতকলা এবং আসুরিক বিকাশসম্পন্ন ৭ কলায় চরিত্রগত ভেদ আছে। আসুরিকগণ নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক ও সুবিধাবাদী। দৈবী সম্পদ সম্পন্নগণ কোমল হৃদয়, সমাজ-হিতৈষী বীর, দাতা, উদার চরিত্র।

রাজা, জমিদার, বণিক, শাসনকর্ত্তা, রাজপ্রতিনিধি, গোয়েন্দা, পুলিস কর্ম্মচারী প্রভৃতির মধ্যে এই কলার চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

৭ কলার বিকাশের মত মানসিক লক্ষণ কিন্তু বিকাশে ৪।০ বা ৬ কলার মত স্বভাব এমন এক স্তরের মানুষ পাওয়া যায়। ইহাদিগকে তোমরা অপুষ্ট কলা বা 'কুবিষ্ণু' বিকাশ জানিবে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ। ইহারা সমাজের ভীষণ ক্ষতি করে। নির্লজ্জ মিথ্যুক, চাটুকার, অত্যন্ত স্বার্থপর, চোর, গুণ্ডা। ইহারা এত নির্লজ্জ যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন নূতন মিথ্যা কথা বলিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে, অদার্শনিক বিশ্বাসবাদী ধর্ম্মের আড়ালে এবং নিম্নতম পুলিসে এ স্তরের মানুষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

৮ কলার বিকাশকে উন্নত শিবস্তরের বিকাশ বলে। ইহা ঋষি কলা। ত্যাগী, যোগী, সাধক, তপস্বীগণের মধ্যে এ স্তরের লোক পাওয়া যায়। এ স্তরের বিকাশ আজকাল খুবই কম। ইঁহারা ৭ কলা হইতেও বুদ্ধিমান। কিন্তু সব রকম বুদ্ধি ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইঁহারা কোনটারই প্রয়োগ করেন না। সরল, উদার, ত্যাগ ও প্রাকৃতিক জীবনপ্রিয় হন।

৯ কলার অবতার কলা। ৫, ৬, ৭ কর্ম্মীকলা এবং ৮ কলাকে জ্ঞানকলা জানিবে। এই জ্ঞান-কলা অতিক্রম করিলে জীবত্বের মোহ, সম্প্রদায়ের মোহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমাজ প্রেমের স্বাভাবিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া আসুরিকতা ও বর্ব্বরতা ভাঙ্গিবার জন্য কর্ম্ম করেন। জ্ঞান কলার স্বাভাবিক লক্ষণ যোগ, ধ্যান, তপস্যা ও ত্যাগ প্রধান জীবন এবং সোজা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কর্ম্ম করিতে চান না, বড় জোর কর্ম্মীদিগকে পরামর্শ দেন। কিন্তু অবতার কলায় আসিলে প্রত্যক্ষ কর্ম্ম করেন ও আসুরিকগণকে নাশ করেন। ৫×২ = ১০। ৬×২ = ১২। ৭×২ = ১৪। অর্থাৎ গণেশ কলার চরিত্র হইলে ৯ ও ১০ কলার অবতার। সূর্য্য কলার অবতার ১১ ও ১২ কলার অবতার। বিষ্ণু কলার অবতার = ১৩ ও ১৪ কলার অবতার। ইহাই মোটামুটী লক্ষণ। প্রত্যেক অবতার কলাতে ৫, ৬, ৭ কলার লক্ষণ যথেষ্ট থাকে। তবে খুব প্রধানতার ভিত্তি ধরিয়া বিচার করিতে হয়। লেনিনএ ৫ কলার বৈশিষ্ট্য বেশী। শ্রীরামচন্দ্রে ৬ ও ৭ কলার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীবুদ্ধে ৭ ও ৮ কলার বিশেষতা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আরও উন্নত। লেনিনের কর্ম্মবিজ্ঞান খুব কম কলার হইবার দরুণ উহা একটী আসুরিকতা ভাঙ্গিয়া আরও একটী স্থাপনা করাইয়াছে। শ্রীরামের দুর্ব্বলতা থাকিবার দরুণ তাঁহার দ্বারা পৌরোহিত্যবাদ প্রশ্রয় পাইয়াছে। শ্রীবুদ্ধ পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গেন, কিন্তু বেদকে আঁকড়াইয়া ধরিতে ভুল করেন। ফলে এক শক্তিশালী জ্ঞানের ভাণ্ডার পুরোহিতগণের হাতে রহিয়া গেল। শ্রীবুদ্ধ ইহা আঁকড়াইয়া রাখিলে তাঁহার শক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত। ৮ম কলা শান্তি প্রধান কলা এবং ৭ম হইতে ৮ম শ্রেষ্ঠ। এজন্য বৌদ্ধবাদীরা শান্তিতে ঝুঁকিয়া যায় এবং দুর্ব্বলও হইয়াছিল।

আজকাল আমাদের সমাজে ভাববাদী মহাত্মাগণকে অবতার করিবার রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। এইরূপ মানুষকে অবতার করা ও অবতার মানা আমাদের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত অধঃপতনের লক্ষণ। তবে একথা সত্য যে অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা জগৎগুরু কলার মহাত্মা (ষষ্ঠ কলা)।

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলার মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি অবতার কলা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার অনেক কথা ভক্তিবাদ ও ভক্তি সাধনার সুবিধার জন্য সাজানো হইয়াছে। উহাদের অনেক কথার বাস্তব ভিত্তি নাই। কৃষ্ণকে তোমরা মহাভারতে খুঁজিবে। তিনি কুরুক্ষেত্রে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ

প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন শ্রেষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীতে আর হয় নাই। গীতা এই মহাপুরুষের বাণী। ইনি ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতের হিন্দুমাত্রই জন্মাষ্টমী উৎসব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে ইনি নিজের প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম্ম - আসুরিকতার উচ্ছেদ, উপাসনা - শক্তি বা ব্রহ্মোপাসনা এবং জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের দার্শনিকতার সমস্ত রহস্য গীতায় উদ্‌ঘাটিত করেন। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথিরূপের কথাই ভাবিও। আজ গীতা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। গীতাকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মানিলে সমস্ত অহিন্দু ধর্ম্ম মিথ্যা ও কাল্পনিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়া যায়। মূর্খদের মূর্খতা এবং বর্ব্বরদের বর্ব্বরতা আজও ধর্ম্মের নামে চলিতেছে এবং গীতার মত গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের মত গুরু থাকিতে আমরা পরাধীন। এই পৃথিবীতে ইহা সত্যই বিস্ময়কর ঘটনা। আসল কথা পৌরোহিত্যবাদী ও ভাববাদী টীকাকারগণ আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তোমরা ভাগবতের আলোচনা ত্যাগ করিয়া মহাভারতের আলোচনা করিবে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত জীবনী আছে; কিন্তু মহাভারতে তাঁহার সত্যিকার জীবনী স্থান পাইয়াছে। মহাভারত আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

শ্রীরাম। ইনি ১২ হইতে ১৩ কলার মধ্যে বিকশিত ছিলেন। মূল রামায়ণে এই মহাপুরুষের জীবন চরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় এই মহাপুরুষের জীবনে অনেক দুর্ব্বলতা ও ভ্রান্তি ছিল। ইনি আমাদের সমাজজীবনে অতীব প্রিয় ও পূজনীয় মহাত্মা। চৈত্র রাম নবমীতে এই মহাপুরুষের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। ইনি রাবণ বধ করিয়া নারী নির্য্যাতন ও রাক্ষসবাদ (শোষণবাদ) ধ্বংস করেন। সত্য যুগের ইন্দ্রাদি নেতাদের মতন ইনিও আশ্বিন মাসে মহাশক্তির উপাসনা করিয়া রাক্ষসবাদ ধ্বংস করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তোমরাও আসুরিকতা, বর্ব্বরতা, নারী নির্য্যাতন ও শোষণবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য মহাশক্তির উপাসনায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। 'গায়ত্রী উপাসনা' মহাশক্তিরই নিত্য কর্ত্তব্য উপাসনা জানিবে।

শ্রীবুদ্ধ। ইনি ১৪ হইতে ১৫ কলায় বিকশিত ছিলেন। ১৫ কলায় বিকশিত থাকিবার দরুণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম একটু শান্তি প্রধান ধর্ম্মে ঝুঁকিতে চেষ্টা করে। মানুষের চরিত্রবলকে ভিত্তি করিয়া সমাজ হইতে গুণ্ডামি ও বর্ব্বরতা বহিষ্কারের আদর্শ স্থাপনায় ইনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি আমাদের সমাজে সবচেয়ে নিকটতম অবতার। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই মহাত্মার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মের পর আমাদের দেশে আর অবতার কলার মহাপুরুষের জন্ম হয় নাই। যদি তোমরা কখনও প্রয়াগ বা কাশীতীর্থে গমন কর তবে দেখিতে পাইবে; পুরোহিত সংকল্প মন্ত্রে বলিতেছেন - "বিষ্ণু রোঁ তৎসৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ.....শ্রীবুদ্ধাবতারে....." ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহা দ্বারা তোমরা দেখিতে পাইতেছ এটা বৌদ্ধাবতারের যুগ চলিতেছে। শ্রীকল্কীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সবটাই বুদ্ধ অবতারের যুগ। ইনি পৌরোহিত্যবাদ ও অছুঁতবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া এক সুন্দর সাম্য সমাজের ভিত্তি দান করিয়াছিলেন। ইনি উপনিষদের জ্ঞান ও আদর্শময় জীবনকে অতি সহজ পন্থায় সমাজের সামনে স্থাপন করেন। উহা এখন 'পঞ্চশীল' ও 'দশশীলের' অনুশীলন নামে পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মণ্যবাদের আড়ালে পৌরোহিত্যবাদ পুনঃ গজাইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আজও পৌরোহিত্যবাদ ও অছুঁতবাদ ভাঙ্গিবার অনুকূলে জনমতের অভাব নাই। তোমরা এই সন্ধিক্ষণে বৌদ্ধ হিন্দুদের মত বেদকে ভিত্তি না করিয়া ভুল করিও না। বরং বেদই আমাদের সমাজ জীবনের প্রধান ভিত্তি। তোমরা বৈদিক কৃষ্টির যথেষ্ট চর্চ্চা বৃদ্ধি করিবে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। ঐদিন সমস্ত ভারতে ও পৃথিবীতে ধর্ম্ম পূর্ণিমা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তোমরা ইহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিবে। কারণ ইনি এই যুগের অবতার। আমাদের দেশের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এক অদ্ভুত ভ্রান্তি জাতীয় নেতাদের কার্য্যে প্রকাশ পায়। নেতাগণ সেই সময় গয়ার বুদ্ধ মন্দিরটি বৌদ্ধ হিন্দুদের হাতে দিবার আন্দোলন করিতে থাকেন! এই ঘটনায় হিন্দুদের প্রাণে বিশেষ আঘাত দিতে নেতাগণ মোটেই ইতস্ততঃ করেন নাই। নেতাদের জীবন এবং শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্য আদর্শে গড়িয়া উঠিবার দরুণ তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট অজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের বহু কার্য্যে হিন্দু ধর্ম্মের এবং

ন্যায়ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। গয়ার শ্রীবুদ্ধ মন্দির বিদেশীয় বৌদ্ধদের হাতে সপিয়া দিবার আন্দোলন উহাদের অন্যতম। নেতাজী সুভাষ প্রবর্ত্তিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্য্য কলাপ বৃদ্ধি হইবার পর দুর্ব্বল নেতাদের চিন্তাবৃত্তি সংশোধিত হয়। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের শুভ লক্ষণ। তোমরা জানিয়া রাখিবে শ্রীবুদ্ধ আমাদের ১০ জন প্রধান অবতারের একজন। তিনি শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে একটুও কম পূজ্য বা কম প্রিয় নহেন। বুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের একজন প্রধান নেতা এবং প্রধান গুরু। রামের ধর্ম্ম যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম বুদ্ধের ধর্ম্মও তেমনই হিন্দুরই ধর্ম্ম। প্রধান অবতারদের কথা বলা হইল। তোমরা ব্রহ্মস্তোত্রে ও গায়ত্রী মন্ত্রে অবতার উপাসনার উপসংহার করিও। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে এইসব অবতার কলার মহাত্মাগণ একাধারে কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আদর্শ বিগ্রহ। ইঁহারা ব্রহ্ম কর্ম্মী এবং ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাদের চরিত্র আলোচনাও ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মকর্ম্মের সহায়ক। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শাস্ত্র মাত্রেই আছে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বভাব আমরা অবতার চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। রামের চরিত্রে সাতকলার দৈবীভাব বেশী ছিল, বুদ্ধের চরিত্রে আট কলার ঋষিজ্ঞান এবং যোগীজ্ঞান অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে প্রস্ফুটিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে শক্তিস্তরের ১৬ কলার কর্ম্ম-প্রতিভা নিখুঁতভাবে স্থান পাইয়া ছিল। রাম রাজাধীশ, বুদ্ধ যোগীশ্বর, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বা ঈশ্বরতুল্য প্রতিভা সম্পন্ন। রাম হিন্দুদের সমাজ জীবনের হৃদয় কেন্দ্র, বুদ্ধ হিন্দুদের সমাজ জীবনের শিবপিণ্ড এবং কৃষ্ণ আমাদের সমাজ জীবনের ব্রহ্মনাড়ী স্বরূপ। এই পৃথিবীর বুকে এই তিনটী চরিত্র আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

রাম, বুদ্ধ ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া এই পৃথিবীতে যত লোক ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাদের সংখ্যা এই পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাহাদের অর্দ্ধেকের বেশী। শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসিবে যখন বৌদ্ধবাদ ও গীতার ধর্ম্মে সমস্ত মানুষের চিন্তা প্লাবিত হইয়া যাইবে। এবং সমস্ত অহিন্দু ধর্ম্মের দার্শনিকতা 'মিথ্যা' বলিয়া তিরস্কৃত হইবে। অধিক কি অহিন্দুরাও নিজ নিজ ধর্মের দার্শনিকতাকে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিবে। এবং হিন্দু দার্শনিকতার নকল করিয়া মিথ্যুক ও কাফের হইতে লজ্জা বোধ করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীবুদ্ধ আমাদের দেশে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সৎ, চিৎ ও আনন্দ (অদ্বৈত তত্ত্বই আনন্দ) তত্ত্বই ব্রহ্মস্তোত্রে বিদ্যমান। কাজেই অবতার উপাসনা তোমরা ব্রহ্মস্তোত্রেই করিবে।

তোমরা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম শ্রীবুদ্ধকে ব্রহ্মনাড়ীরূপেই জানিবে। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহাদিগকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মস্তোত্রের ব্রহ্মরূপ বলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায়ও বলিয়াছেন যে তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়স্থিত আত্মা বা ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থিত ব্রহ্ম।

যথা - অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥

হে অর্জ্জুন, আমি সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থিত 'আত্মা'। আমি সমস্ত ভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ।

এবার তোমাদের নিকট মহাপুরুষের উপাসনা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

মহাপুরুষ উপাসনা

আমাদের সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন। কাজেই আমাদের দেশে যে সব মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে শুধু নাম বলিলে এইরূপ ছোট একখানা পুস্তক হইয়া যাইবে। কয়েকজন মাত্র মহাপুরুষের নাম বলিব। ইহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞানশক্তি প্রধান ছিলেন এবং কেহ কেহ ছিলেন কর্ম্মশক্তি প্রধান। আমাদের দেশে মধ্যযুগে বহু ভাববাদী মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন।

স্বয়ম্ভূব মনু, সপ্তঋষি (যথা - কশ্যপ, অত্রি, গৌতম, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ), ৪ জন কৌমার্য্য ব্রতধারী ঋষি (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার), ব্যাস জৈমিনী, গৌতম, পাণিনি, পতঞ্জলি, কপিল, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, ভরত, লক্ষণ, মহাবীর হনুমান, মহারাজ শিবী, যযাতি, ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জুন, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেকটি জীবন হইতে আমরা অতি সামান্য কথায় বৃহৎ বৃহৎ রত্ন সংগ্রহ করিব। আমাদের দেশের মধ্যে দুর্ব্বল স্তরের চিন্তা ও কর্ম্মে বিশ্বাসী অনেক মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন। আমরা তাহাদের জীবন আলোচনা করিবার প্রয়োজন মনে করি না। আমরা ঐসব মহাত্মাগণকেও অশ্রদ্ধা করি না।

স্বয়ম্ভুব মনু। ইনি আমাদের এই হিন্দু সমাজের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইনি এই সমাজকে একটা শক্তিশালী এবং দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনা করেন। এই সমাজের উপর দিয়া নানাযুগে নানাপ্রকার উত্থান পতন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শত বিপ্লবের মধ্য দিয়া আসিয়াও এই সমাজ আজও বাঁচিয়া আছে। অনুপযুক্ত পরিচালকের অদূরদর্শিতায়, পুরোহিতদের স্বার্থপরতায় এবং দুর্ব্বল স্তরের সাধুদের ভাবধর্ম্মের প্রাবল্যে আজ আমাদিগকে অনেক দুর্দ্দশা সহ্য করিতে হইতেছে। শীঘ্রই একদিন এমন আসিতেছে যে দিন এই সমাজের একটা শক্তিশালী সংস্কার আসিবে। কারণ স্বয়ম্ভুবের সেই শক্তিশালী চিন্তা এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্বয়ম্ভুব ১৪ জন মনুর প্রথম মনু। ১৪ জন মনুর মন্বন্তর গত হইলে একটি মহাপ্রলয় হয়। এখন সাবর্ণি মনুর মন্বন্তর চলিতেছে। তোমরা পুরাণে এসব কথা জানিতে পারিবে।

আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারের সংস্কারকদের চিন্তাধারা ও পশ্চিমের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকারের। পশ্চিমের ডেমোক্রেশী, সোসিয়ালিজম্ (কমিউনিজম্) ও ফ্যাসিজ্‌ম্-এর নাম তোমরা শুনিয়াছ। এসব সমাজ ব্যবস্থা স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষবাদ প্রধান হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১০০ বৎসরের মধ্যেই ডেমোক্রেশীর যৌবনকাল শেষ হইয়াছে। উহার পর সোসিয়ালিজম্‌এর জন্ম হয়। এই সোসিয়ালিজম্‌কে শীঘ্রই বৃদ্ধাবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ফ্যাসিজ্‌ম্ এই দুইটীর মধ্যে একটু যুক্তি সম্মত হইলেও উহাও আসুরিক বিধান। এই সব আসুরিক বিধান হইবার দরুণ ইহাদের প্রত্যেকটির আয়ু কম। কোন সমাজ বা সংগঠনের বিজ্ঞানেই বর্ব্বরতা, বিদ্বেষ ও অত্যাচারকে কেন্দ্র করিলে উহার ফল ভাল হয় না। কখনও আসুরিক সমাজ ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। স্বয়ম্ভুব প্রবর্ত্তিত হিন্দু সমাজ এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার ইহাই কারণ যে ইহার ভিত্তিতে শক্তিশালী যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। ইহা যে আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ইহার কারণ ইহাতে পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদের পরগাছা জমিয়াছে। ইহার সংস্কার হইলে ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী সমাজে পরিণত হইবে। তোমরা ইহার আবশ্যক সংস্কারের সহায়ক হইও।

সপ্ত ঋষি। তোমরা গীতা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে - "মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা। মদ্ভাবামানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ"॥ ১০/৬॥ অর্থাৎ সাতজন ঋষি এবং চারজন মনু ইহারা আত্মার মানস সৃষ্টি এবং সকল প্রজাই এই ঋষি ও মনুদের সন্তান। তোমরা পিতৃপক্ষে গঙ্গা বা জলাশয়ের ঘাটে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে দেখিয়া থাকিবে। মহালয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী এক পক্ষ কালকে পিতৃপক্ষ বলে। এই পক্ষের নবমীকে মাতৃ নবমী বলে। ইহা মাতৃপুজার দিন। পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণ করিবার জন্য পিতৃপক্ষের অনুষ্ঠান হয়।

তোমরা জানিয়া রাখিবে আমাদের সমাজজীবন অমর। আমাদের আত্মা বা অধ্যাত্ম জীবনও অমর। আমাদের শরীরটা বেশীদিন থাকে না। ইহা সাধারণতঃ ১০০ বছরের মধ্যে নষ্ট হয় এবং অণুপরমাণুতে মিলিয়া যায়। আমরা যদি এই সামান্য দিনের জীবনের কথা বেশী ভাবি এবং সমাজজীবনের কথা গ্রাহ্য না করি তবে জ্ঞানিগণ আমাদিগকে মূর্খ ও স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার করেন। সমাজ কি বিজ্ঞানে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কিরূপ সুন্দর ও চিরসত্য বিজ্ঞানে আজও দাঁড়াইয়া আছে উহা বুঝিবার জন্য আবশ্যক সব কথাই তর্পণে আছে। একজন দার্শনিক জ্ঞানী অনেক গবেষণা ও বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন তর্পণে সেই সব কথাই আছে।

ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বসংসার এবং তুমি-আমি সবই উৎপন্ন হইয়াছি। ব্রহ্ম হইতে সোজা কেহ সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হইবার নিয়ম আছে। এজন্য ব্রহ্মস্তর (শক্তিস্তর), তাহার পর রুদ্রস্তর (শিবস্তর), তাহার পর বিষ্ণুস্তর (বা হিরণ্য গর্ভ), ইহার পর প্রজাপতি (ব্যাপক মন), ইহার পর মানস পুত্র সপ্তঋষি ও মনুগণ এবং তাহাদের হইতে আমাদের সকলের পূর্ব্বপুরুষগণ সৃষ্ট হইয়া পরে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। আমাদের সমাজ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ ও কম্যুনিষ্টদের মত ঝগড়া করিবার বা বর্ব্বরতা করিবার সমাজ নহে। আমাদের সমাজ একদল মানুষকে কাফের বা বিধর্ম্মী কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাদের উপর বর্ব্বর অনুষ্ঠানেরও সমাজ নহে। আমাদের সমাজ অর্থে ব্রহ্মস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থূল বিশ্ব এবং ব্রহ্মস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থূল বিশ্বে যত প্রকার জীব আছে সকলের সমষ্টি এবং এই সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের উপর আমাদের যে কর্ত্তব্য এবং এক সমাজ-বোধক নিয়ম ইহাই আমাদের সমাজ। সমাজ গঠনের এমন মহান বিজ্ঞান ও মহান আদর্শ আর হইতে পারে না। পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদ দেখিয়া বিচলিত হইও না। ভুল ভ্রান্তি সব মানুষেরই হয়; আবার সংশোধনও মানুষই করে। এমন অমর চিরসত্য সমাজে জন্ম হইয়া আমরা ধন্য। এই চিরসত্য সমাজকে উপেক্ষা করিবার জন্য যাহারা ভ্রান্ত ও পরিকল্পিত সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরও ভ্রান্তি কাটিবে। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সমাজের অস্তিত্ব নাই, ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না সেই সমাজ যে ২, ৫ শত বৎসরের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে না ইহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে? জানিয়া রাখিবে যার আরম্ভ আছে উহার শেষও আছে। কিন্তু যাহার আরম্ভ অনন্ত ব্রহ্মে তাহার শেষও অনন্ত ব্রহ্মে। অর্থাৎ সেই সমাজ ব্রহ্মেরই মত অনাদি ও অনন্ত। যাহা হউক ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি, সপ্ত ঋষি, পিতৃপুরুষ, মাতৃপুরুষ, বান্ধব, অবান্ধব, মহাপুরুষ, গন্ধর্ব্ব, বনস্পতি ও বিশ্বজগতের সকলের উপর আমাদের কর্ত্তব্য এবং এক সমাজবোধকে জাগ্রত করিবার জন্য তর্পণ (তৃপ্তি বিধান) যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিও আমাদের জীবন শুধু মানব সমাজকে লইয়াই নহে, এমন ব্যাপক সমাজ-বোধক সমাজ এই পৃথিবীতে আর হয় নাই এবং হইবে না। এমন ব্যাপক সমাজ-বোধক সমাজবিজ্ঞান গঠিত হইলেও তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে হিন্দু সমাজের কোন শক্তিশালী মহাত্মাই আসুরিক নীতিতে পরিচালিত সমাজকে সহ্য করিবার নির্দ্দেশ দেন নাই। কারণ উহারাই সমাজ জীবনের শত্রু। উহারা কাল্পনিক ধর্ম্ম, কাল্পনিক সমাজ ও কাল্পনিক রাষ্ট্র গড়িয়া সমাজ জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া থাকে।

বৃত্তি ও কর্ম্ম ব্যবস্থায় আমাদের সমাজের বর্ণভেদ থাকিলেও পিতৃপক্ষে সকলেই সমবেত ভাবে পিতৃ তর্পণ বা পিতৃ উপাসনায় একত্র হয়। প্রত্যেকেই জানে তাহার গোত্র কি? এবং দেখা যাইবে কোন না কোন ঋষি হইতে তাহার বংশের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের কেবল পিতাই নহেন, তাঁহারা আমাদের গুরু, আমাদের শিক্ষক এবং আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা সকলেই তপস্বী, জ্ঞানী, ত্যাগী ও যোগী ছিলেন। তাঁহারা আমাদের দেশের অণুপরমাণুকে পবিত্র করিয়া দেশকে অত্যন্ত প্রিয় ও পূজ্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে, সমাজকে, দেশকে কিরূপ ভালোবাসিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম কিরূপ ন্যায়পরায়ণতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা তোমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারিবে। বেদ ঋষিগণেরই তপস্যালব্ধ জ্ঞান বা অনুভূতির সংগ্রহ গ্রন্থ। আত্মা যে জীবমাত্রের অমর সত্ত্বা ইহাও ঋষিগণই অনুভব করিয়াছিলেন। ঋষি, বেদ এবং আত্মাকে ভিত্তি করিয়া আমাদের সমাজ অনন্তকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

অনেকে, সমাজের সমস্ত শাখায় অন্নচলন প্রচলিত না থাকাটাকে সমাজজীবনের বিশেষ আবর্জ্জনা মনে করে। তোমরা ঐসব লইয়া হট্টগোল করিও না। উচ্চ বৈজ্ঞানিক বৈদিক আচার ধর্ম্ম সমস্ত শাখায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বহুদিন ধরিয়া বংশগত ভাবে আচারধর্ম্মের অনুশীলন হইবার দরুণ, সমাজের সমস্ত শাখায় একই আচার ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত নাই। কাজেই অন্নচলন ও বিবাহ নিয়মকে কিছুতেই ব্যাপক করা সম্ভব নহে। কাহারও ইচ্ছার বা ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধে কাহারও হাড়িতে অন্ন গ্রহণে বাধ্য করা 'বর্ব্বরতা'র অনুষ্ঠান জানিবে। তবে ধর্ম্মস্থানে ও মন্দিরে ছুঁতমার্গ, আইন করিয়াই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অনুষ্ঠিত সমাজধর্ম্মের উচ্চ বৈশিষ্ট্যকে আমরা কিছুতেই অশ্রদ্ধা করিতে পারিব না। বরং আমরা উহাকে শ্রদ্ধা করিব। আমরা জানি সৃষ্টির ক্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি বিদ্যমান। পরে সপ্ত ঋষি ও চার মনুকে কেন্দ্র করিয়া মানব সৃষ্টি। বর্ব্বর হইয়া সমাজ ভাঙ্গা বা সমাজ গড়া আমরা সমর্থন করি না।

সৃষ্টির এই নিয়ম সম্বন্ধে পৌরোহিত্য বাদিগণকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিতে দেখা গিয়াছে। কাজেই সেই সম্বন্ধেও বলা যাইতেছে -

ওঁ ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃকৃতঃ॥

ঊরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাᳬশূদ্রোঽ জায়ত॥ যজুর্ব্বেদ॥ পুরুষসূক্তম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞানী) তাঁহার মুখস্বরূপ, ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা ও শাসক) তাঁহার বাহু স্বরূপ, বৈশ্য (ব্যাপারী, পশুপালক ও কৃষকগণ) তাঁহার ঊরুস্বরূপ এবং শূদ্র (মজুর শ্রেণী), তাঁহার পদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

ভ্রান্ত ব্যাখ্যাতাগণ বলিয়া থাকেন - "হাঁ ইহা সত্য যে একই পরমাত্মা হইতে সব শ্রেণীর মানব সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সকলেই এক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কাজেই সকলেই একই ঋষির বংশধর নহে।"

আমরা তাহাদিগকে ভাল করিয়া বেদপাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা বলিতে পারি - তাঁহার মুখ, হাত, পা, বলিয়া কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। তিনি ব্যাপক। সমাজজীবনের বিভিন্ন কর্ম্ম বিভাগকে একই পরমপুরুষের চার প্রকার নিয়ম বুঝানো ভিন্ন, মন্ত্রের কদর্থ করা অন্যায়। প্রমাণ যথা -

ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপত্রে দ্যাবা ভূমিং জনয়ন্দেব একঃ॥

যজুঃ অঃ ১৭। মং ১৯॥

"তিনি একমাত্র পরমাত্মা তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু, বিশ্বতোপাদ অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পা, সবই ব্যাপক। তিনি ঐরূপ ব্যাপক বাহুদ্বারা উড়নশীল পরমাণুদ্বারা দৈবলোক ও পৃথিবীকে উৎপন্ন করেন।"

তাঁহার মুখ বাহু যদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইত, তবে ব্রাহ্মণদের চেহারাটিতে নারায়ণ শিলার মত একটী মুখ মাত্র হা করিয়া থাকিত এবং তাহাদের অন্য অঙ্গ থাকিত না। ক্ষত্রিয়দের চেহারা একটী বেড়ীর (হাড়ীধরা) মত হইত। বৈশ্যরা হইত এক একটি যাঁতীর মত। শূদ্ররা হইত এক একটি সাঁড়াশীর মত। ঠিক ঠিক মানুষের আকার কেহই পাইত না।

তাঁহার পাণিপাদগুলি কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র। পরমাণু কণাগুলি কিরূপে এই বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত, উহার আভাষ তোমরা গৃহ মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ স্থানে দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে, পরমাণু কণাগুলি স্বাধীন ভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। এই কণাগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে একত্রিত হইয়া এই পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তোমরা বৈশেষিক দর্শনে দেখিতে পাইবে।

বেদের কদর্থ করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ কদর্থের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কর্ম্ম নিয়মের চার প্রকার ভেদ। ইহা পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমাজেই বর্ত্তমান।

গীতায়ও ব্রহ্মলক্ষণ বর্ণনা অংশে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। যথা -

সর্ব্বতঃপাণি পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা ১৩-১৪

সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাপক পাণি, ব্যাপক পদ, তিনি ব্যাপক শির, অক্ষি ও ব্যাপক মুখ স্বরূপ। তাঁহার শ্রুতিও ব্যাপক। তিনি সর্ব্বকে আবরিত করিয়া অবস্থিত॥ অর্থাৎ ব্রহ্ম তত্ত্ব ব্যাপক, তাঁহাতে নানা প্রকার নিয়মগুলি ব্যাপক ভাবেই বিদ্যমান। সেইসব নিয়মগুলিই পাণিপাদ স্বরূপ।

তর্পণ বিধানে ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি ও সপ্ত ঋষি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বা বিভিন্ন বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বা ব্যক্তি নহেন।

সৃষ্টির মূলে একই ব্রহ্মতত্ত্ব ও সপ্তঋষি হইলেও আমাদের বংশ পরম্পরাতে আচার-ধর্ম্মের যে যথেষ্ট ভেদ বিদ্যমান ইহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন দেখি না। ইংরেজ জার্ম্মানীরা একপাতে খায় এবং বিবাহ আদিও করে তবুও ঝগড়ার শেষ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এক পাতে না খাইলেও উচ্চ বর্ণে ও অনুন্নত বর্ণে কস্মিনকালেও ঝগড়া বিবাদ হয় নাই।

এদিকে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস প্রবর্ত্তকগণ আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন। তাহাদের মতে আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে এদেশে আসিয়া আদিম অধিবাসীগণকে অছুঁত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইহা স্বীকার করি না। আমরা জানি সপ্তঋষি হইতে মানুষ মাত্রেরই জন্ম। এই সপ্তঋষি কোন সুপ্রাচীন যুগে আমাদের দেশেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে নানা আকারের মাথার কঙ্কাল বিশিষ্ট মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এক এক ঋষির বংশধর। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, কোচ, দ্রাবিড়ীর মাথার কঙ্কাল বিভিন্ন হইবার কারণ বিভিন্ন প্রকারের ঋষিসন্তান বলিয়া। ঋষিসন্তানগণ এখান হইতে ধীরে ধীরে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তোমরা যদি একটু অন্তর দৃষ্টি লইয়া বিচার করিয়া দেখ, তবে দেখিতে পাইবে এখান হইতেই মানব সভ্যতার মূলধারা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র কর এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দেশের লোকগুলিকে দেখ; দেখিতে পাইবে সবই এই দেশেরই এক এক প্রান্তের লোকদের বংশধরগণ দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আবার খুব প্রাচীন সভ্যতার আলোচনা কর দেখিতে পাইবে এখান হইতেই সব সভ্যতা ধীরে ধীরে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের হইতে যতদূর যাইবে সভ্যতা ততই ক্ষীণ দেখিতে পাইবে।

তোমরা প্রশ্ন করিতে পার তবে এইসব অনুন্নতরা কে?

উঃ। প্রথম কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হয়। পরে বংশ পরম্পরাতে বর্ণ ও কর্ম্মভেদ অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্ত্তী যুগে সবর্ণ বিবাহ শ্রেষ্ঠ বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ উহা হইতে অপকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া মানা হয় এবং বিলোম বিবাহ নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হীন বর্ণের সন্তানগণ উচ্চবর্ণের কন্যাগণকে বিবাহ করিলে উহাকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলা হইত। এইরূপ বিবাহের ফলে যে সন্তান হইত তাহারা অনুন্নত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

যে সময় বর্ণধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় সেই সময় মহারাজ স্বয়ম্ভুব মনুর রাজত্বকাল ছিল। সেই সময় তাঁহার রাজত্ব সীমার মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র শাসক ছিলেন, যাঁহারা বর্ণধর্ম্ম মানিতেন না। এইজন্য তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যে বর্ণধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে এইসব সমাজ অংশকেও অনুন্নতদের মধ্যে ধরা হয়। এমন সময় আসিবে যখন এক জোর আন্দোলন আসিয়া আমাদের শিক্ষার মধ্যস্থিত এই মিথ্যা ও কল্পিত ইতিহাস ভাঙ্গিয়া দিবে; কারণ এইরূপ মিথ্যা ইতিহাস আমাদের সমাজজীবনকে অকারণ কলুষিত করিতেছে এবং সমাজ গঠনের অন্তরায় হইতেছে।

ব্যাসদেব। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে ব্যাস পূর্ণিমা বলে। এই পূর্ণিমাতে সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকগণ ভ্রমণ শেষ করিয়া একস্থানে (গুরুর নিকট) অবস্থান করিয়া শাস্ত্র আলোচনা ও সাধনা করিয়া থাকেন। এই পূর্ণিমাতে

হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত শাখার আচার্য্যগণের (বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি) পূজা উৎসবাদি হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমানে যে সব প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিতে পাই, উহার একটা বৃহৎ অংশ ব্যাসের সংকলিত। ইনিই বেদের মন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে ঋক্, সাম, যজুঃ, ও অথর্ব্ব এই চারভাগে ভাগ করিয়াছেন। যাহাতে বেদের পঠন পাঠন ভালভাবে চলিতে পারে এজন্য তিনি ইহার আরও শাখা বিভাগ করেন। বিভিন্ন আচার্য্যের টোলেতে উহাদের পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তোমরা বেদান্ত সূত্রের নাম শুনিয়াছ। এই বেদান্ত সূত্র ব্যাসদেবের লিখিত গ্রন্থ। আচার্য্য শঙ্কর এই বেদান্ত সূত্রের অদ্বৈত-বাদ ব্যাখ্যা করেন।

জৈমিনী। ইনি কর্ম্মমীমাংসা দর্শন রচনা করেন। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড কিভাবে সম্পন্ন হইবে এই সম্বন্ধে এই দর্শন শাস্ত্রখানা রচিত। বেদের জ্ঞান ভাগ (উপনিষদ্) এর সূত্রকারক মহর্ষি ব্যাস। উহারই নাম 'বেদান্তদর্শন'। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধান মহর্ষি জৈমিনী প্রবর্ত্তন করেন। অনেকের ধারণা এই দর্শনশাস্ত্রখানাই আমাদের দেশের পৌরোহিত্য বাদের প্রবর্ত্তনের হেতু হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এই যজ্ঞভাগকে অহিংসার নামে বেশ ভালোভাবে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন; যে কারণে পৌরোহিত্যবাদিগণ বৌদ্ধগণকে নাস্তিকবাদী বলিয়া বদনাম করিতেন। বঙ্গদেশের ঝড়ের সময় 'জৈমিনীর' নাম উচ্চারণ করিতে শুনা যায়। যজ্ঞদ্বারা দৈবজগৎ তৃপ্ত হয়। ঝড় ও বজ্রপাতকে দৈব দুর্ব্বিপাক বলা হয়। জৈমিনী যজ্ঞবিধানের প্রবর্ত্তক।

মহর্ষি গৌতম। ইনি ন্যায় দর্শনের রচয়িতা। ইহা অতীব সুন্দর দর্শন। ইহার অন্য নাম তর্কশাস্ত্র (Logic)। কাশী ও নবদ্বীপে ন্যায়ের বিশেষ চর্চ্চা হইয়া থাকে।

মহর্ষি কণাদ। ইনি বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা। ইহাকে পরমাণুবাদ বলে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইদানীং যে সব দর্শন শাস্ত্র লিখিয়াছেন সেই সব দর্শন শাস্ত্র বৈশেষিক ভিত্তিতে লিখিত।

মহর্ষি কপিল। ইনি বঙ্গদেশের পাদদেশে সাগর সঙ্গমে অবস্থান করিতেন। এখনও পৌষ সংক্রান্তির দিন এই মহামুনির আশ্রম দেখিবার জন্য প্রকাণ্ড সম্মিলন হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শনের ইনি বক্তা। ইঁহাকে আদিজ্ঞানী বলা হয়। সমস্ত হিন্দুদর্শনের চাবি সাংখ্য দর্শন। মহারাজ সগরের সন্তানগণ অত্যন্ত আসুরিক হইয়া অত্যন্ত কুকার্য্য আরম্ভ করিলে মহর্ষি তাহাদিগকে শাপ দিয়া ধ্বংস করেন। ইনি তন্ত্র শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত প্রবর্ত্তক।

মহর্ষি পতঞ্জলি। ইনি যোগ দর্শনের রচয়িতা। ইহা মনোবিজ্ঞানের ও যোগবিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। এই দর্শনের কোথাও একটু খুঁত নাই। ইহা পাঠ করিবার পর তোমরা বুঝিতে পারিবে - 'হিন্দুধর্ম্ম' একটী বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম।

মহর্ষি পাণিনি। ইনি পাণিনি ব্যাকরণের রচয়িতা। ইহাও একখানা দার্শনিক গ্রন্থ। ইহা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। আমাদের দেশের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষারই বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণগুলি পাণিনির ভিত্তিতে লিখিত।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। তোমরা যখন বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা উপনিষদ্ ভাগ পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে, কৃষ্ণ ও শুক্ল নামক দুইপ্রকার যজুর্ব্বেদের নাম আসিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ শাখার একজন আচার্য্য ছিলেন। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উগ্রতপা মহাত্মা ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ ইনি ব্যাসের নিকট অন্য গুরুভাইগণকে হীনবীর্য্য বলেন। ইহাতে ব্যাস রুষ্ট হন। ইনি বেদ ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন। উহা ত্যাগ করিবার পর ইনি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। বেদহীন জীবন তাঁহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হইতে থাকে। তিনি তপস্যা দ্বারা বেদ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং সক্ষম হন। তিনি যাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন উহার নাম কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এবং তিনি স্বীয় প্রতিভা ও তপস্যা দ্বারা যাহা আয়ত্ত করিয়াছিলেন সেই বিরাট গ্রন্থের নাম শুক্ল যজুর্ব্বেদ। এই মহাতপা মহর্ষির কথা ভাবিলে বাস্তবিক শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া যায়। ইঁহার জীবন আমাদিগকে ভালভাবেই শিক্ষা দেয় - ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, একনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও উন্নত লক্ষ্য থাকিলে মানুষ যে কোন জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে।

সিদ্ধনাগার্জ্জুন। ইনি অতীব শক্তিশালী একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহার প্রণীত রসায়ন শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্র আছে।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র। তোমরা কাশীতে হরিশ্চন্দ্র ঘাট দেখিতে পাইবে। মহারাজা এই ঘাটে ডোমের ক্রীতদাস হইয়া মৃতের শুল্ক আদায় করিতেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ইনি নিজের সমস্ত রাজত্ব দান করেন। সব দান হইয়া যাইবার দরুন দক্ষিণার অর্থ তাঁহার ছিল না। তিনি ডোমের ক্রীতদাস হইয়া দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করেন। এই ঘটনার পর তাঁহার রাণী শৈব্যা এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের পুষ্প চয়ন করিত। একদিন রোহিতাশ্ব পুষ্প চয়ন করিতে যাইয়া সর্পাঘাতে মারা যায়। অর্থহীনা অসহায়া শৈব্যা সেই মৃত বালককে লইয়া সৎকার করিতে অন্ধকার রাত্রিতে এই ঘাটে একাকী আসেন এবং শুল্কের অর্থ ছাড়িয়া দিবার জন্য ডোমের বেশধারী স্বামীকে অনুনয় বিনয় করিতে থাকেন। এই ঘটনায় ঐ ব্রাহ্মণের মনোবিজ্ঞানের যে নীচ ও হীন ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং যেরূপ ত্যাগ ও বিনয়ভাব শৈব্যাতে প্রকাশ পাইয়াছে উহা রামায়ণে দেখিয়া তোমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। এই ঘটনার মত শত শত ঘটনা আমাদের সমাজে নিত্য আসিতেছে। তোমরা কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের মত মনোবৃত্তি সব সময়ই ত্যাগ করিও।

এই মর্ম্মস্পর্শী ঘটনার পর হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের জীবনের পরীক্ষা শেষ হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বালকের জীবন দান করিয়া তাঁহাদের রাজ্য দান করিলেন।

বিক্রমপুরে (ঢাকা) রামপালের নিকটে একটি পুকুরের মত স্থান আছে (সুখবাসপুরের নিকট)। উহা বারমাস জলজ ঘাসে এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে উপরে মানুষ ও পশুগণ বেড়াইলেও দাম টলে না। কিন্তু মাঘী পূর্ণিমার দিন যদি তুমি ঐ পুকুরের ধারে যাও, দেখিতে পাইবে দামগুলি সবই ডুবিয়া গিয়াছে এবং পুকুরে নির্ম্মল জল রহিয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এই স্থানে মাঘী পূর্ণিমায় একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুকুরটী তাঁহারই যজ্ঞকুণ্ড ছিল। (মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঐখানে যাইয়া কেন যজ্ঞ করিবেন ইহা বুঝা যায়না। মনে হয় ইহা বঙ্গদেশীয় কোন পুণ্যপ্রতাপী রাজার যজ্ঞকুণ্ড।) প্রতি বৎসর সত্যযুগ উৎপত্তির দিনে ঐ পুকুরটি ধার্ম্মিক রাজার নির্ম্মল স্নেহে প্রজাপালনের স্মৃতি দেখাইতেছে। সেই নির্ম্মল ও পবিত্র দৃশ্যের কথা ভাব আবার কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের ঐ পবিত্র স্মৃতি স্মরণ কর। কাশীর বুকের উপর ঔরঙ্গজেবের কুকীর্ত্তি বিশ্বনাথ মন্দিরের দুর্দ্দশার দৃশ্যও রহিয়াছে। বর্ব্বরতার স্মৃতি ও ধর্ম্ম প্রতাপের স্মৃতি যখন যুগপৎ তোমার মনে জাগিবে তখন তুমি নিশ্চয় জানিবে এক মহান জাতির মহান আদর্শের কোলে জন্ম লইয়া 'আমি ধন্য'।

মহাবীর হনুমান। রামায়ণে এই মহাবীরের কথা জানিতে পারিবে। অনেক মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কৌমার্য্যব্রতে ইনি মূর্ত্তিমান্ দেবতা। নারীর উপর এই বীর পুরুষের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবে ইঁহার একহস্তে গদা ও অন্য হস্তে পাহাড়খণ্ড রহিয়াছে। এই ভাবে তিনি নারীর মর্য্যাদা নষ্টকারী রাবণের প্রতি ধাবমান। ব্রহ্মচর্য্য জীবন বা শিক্ষা জীবনের ইহা এক বড় আদর্শ যে ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় করিতে হইবে, নারীমাত্রকে মাতৃবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা করিতে হইবে এবং নারীর মর্য্যাদা নষ্টকারীকে কঠোর দণ্ড দিতে হইবে। আমাদের দেশে এখন একদল মাতব্বর গজাইয়াছেন যাঁহারা স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করিতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা জানিয়া রাখিবে স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া নয়।

অনেকে হনুমানের সমুদ্র পার হইয়া যাওয়ার ঘটনাকে কল্পিত মনে করে; কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিবে উহা মোটেই কল্পিত ঘটনা নহে। এক সত্য ঘটনা বলা যাইতেছে - কাশীতে বরুণা নদীর তটে প্রতিবৎসর এক রামলীলা হইয়া থাকে। সেখানে ভরতমিলনের দিন রাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমানের বেশধারীগণকে জনসাধারণের দিক হইতে মালা ও ফুলাদি দ্বারা পূজা করিতে দেখিয়া উপস্থিত এক ইংরেজ সব ডিভিসনেল অফিসার একটু বিস্মিত হন। তিনি সেখানে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লইয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকটস্থিত এক পরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ইংরেজ বলেন, "হনুমানের লাফ্ দিয়া সাগর পার হওয়ার ঘটনা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। এভাবে মানুষকে রাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমান সাজাইয়া পূজাও যুক্তিযুক্ত প্রথা নহে।" ভদ্রলোক বলিলেন আমাদের এখানে লোকের বিশ্বাস যে রাম,

লক্ষণ, সীতা ও হনুমানের আত্মা এসব কল্পিত ব্যক্তিতে আবিষ্ট হন। ইংরেজ বলিলেন - যদি আমি দেখিতে পাই এই হনুমান (বেশধারী) এক লাফে এই বরুণা নদী পার হইয়া ওপার গিয়াছে তবে মানি যে সত্যই হনুমান সাগর পার হইয়াছিলেন এবং হনুমান ইহাতে আবিষ্ট হইয়াছেন। বেশধারী হনুমান সব কথাই শুনিতে ছিলেন। তিনি ইহা শুনিবামাত্র চীৎকার করিয়া "মহারাজ রামচন্দ্রজী কী জয়" বলেন এবং জনতাও উহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠে। ইহা হইবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান এক লাফে বরুণার অপর পাড়ে এক বৃক্ষে গিয়া বসেন। জনতায় ভীষণ জয়ধ্বনি উঠিতে থাকে। হনুমান ঐ ভাবে ঐ বৃক্ষে অবস্থান করিয়া সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। এখনও সেই মহাবীরের সমাধি সেখানে আছে। কাশীর বড় গণেশ (মহল্লা) নামক স্থানে এক মন্দিরে এখনও সেই হনুমানের সাজসজ্জা অত্যন্ত যত্নে ও পবিত্রভাবে রক্ষিত আছে। ইহা প্রায় ৮০/৮২ বৎসরের ঘটনা। ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, ভক্তি ও অসুরনাশের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কিরূপ মহান ও শক্তিশালী হইতে পারে, হনুমান চরিত্রে তাহা যথেষ্ট ভাবে বিদ্যমান। এইরূপ কর্ম্মী মহাত্মা এই পৃথিবীতে ২/১ জনই জন্মায়।

মহারাজ শিবি। উশীনর নন্দন শিবি একদিন সভায় বসিয়া আছেন; এমন সময় এক ভয়ভীত কপোত তাঁহার কোলে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ মধ্যে এক বাজও আসিল। বাজ বলিল, এ কপোত আমার বিধিদত্ত আহার, ইহাকে ছাড়িয়া দিন। রাজা বলিলেন, এ আমার আশ্রিত; তুমি অন্য আহার দেখ। বাজ বলিল, এ আমার প্রাকৃতিক খাদ্য; ইহাতে আপনি কিছুতেই বাধা দিতে পারেন না। রাজা অন্য আহার্য্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বাজ কপোতের ওজনে রাজার মাংস প্রার্থনা করিল, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীগণ উহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন - "আপনারা থামুন। ছোট ঘটনাকেও রাজার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। রাজা যদি ছোট ঘটনাতেও অবিচার করেন তবে প্রজাদের নৈতিক পতন অবশ্যই হইবে" - রাজা তুলাদণ্ড আনাইয়া কপোতকে একদিকে রাখিয়া অন্যদিকে নিজের শরীর হইতে এক বৃহৎ মাংসখণ্ড কাটিয়া রাখিলেন। কিন্তু দেখা গেল উহা কপোতের বরাবর হইল না। এদিকে প্রজা ও মন্ত্রী মণ্ডলীতে ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা কয়েকবার মাংস কাটিলেন কিন্তু তাহাতেও কপোত পরিমাণ হইল না। পরে রাজা নিজেকে তুলাদণ্ডে রাখিলেন। ঠিক সেই সময় বাজ ও কপোত অগ্নি ও ইন্দ্ররূপ ধারণ করিলেন এবং রাজার সুবিচারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর রাজা আর রাজ্য করিলেন না, পুত্রের হস্তে রাজ্য দান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

এই ঘটনার সহিত ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের তুলনা করিতে পার; খৃষ্টান রাজা ঐ বিধানে হিন্দুদের উপর নানাপ্রকারে অবিচার করেন এবং মুসলমানগণ ও খৃষ্টানগণকে ঘুষ দিয়া শাসন বিধান স্থাপনা করেন। শাসন বিধানে বৃহৎ ঘুষ পাইয়া মুসলমানগণের এক বৃহৎ অংশ ভীষণ নৈতিক পতন বরণ করে। ফলে দেশের সর্ব্বত্র হিন্দুদের উপর অরাজকতা হইতে থাকে ও শাসন যন্ত্রের সমস্ত অঙ্গে ঘুষেরই রাজত্ব চলিতে থাকে। মহারাজ শিবির কথা "রাজার অবিচারে প্রজার নৈতিক পতনের কথা" একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তোমরা মুসলমান শাসক নিজামের শাসন সংস্কারেও ঐরূপ কুৎসিত অবিচার হিন্দুদের উপর দেখিতে পাইবে। ইহাতে বুঝিতে পারিবে সুবিচার ও নীতি আমাদের জাতের সংস্কারে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের তুলনায় কিরূপ উচ্চ আদর্শে বিদ্যমান্। তোমরা কখনও অবিচারকে সুবিচার বলিয়া মনে করিও না। যে রাজা এবং নেতা অবিচারের পক্ষপাতী তাঁহারা এই পৃথিবীতে পশুর তুল্য।

মহারাজ শিবির ঘটনা তোমরা মিথ্যা মনে করিও না। এইরূপ ঘটনা সব সময় ঘটে না। এইরূপ ঘটনা কেন ঘটে এবং কিভাবে ঘটে, প্রেত উপাসনা অংশে তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইবে।

মহারাজ যযাতি। ইনি জরাগ্রস্ত হইয়াও দেখিলেন বিষয় ভোগের তৃপ্তি হয় নাই। ইহাতে খুবই ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন, যদি তাঁহার জরাকে গ্রহণ করিয়া কোন যুবক তাঁহাকে যুবকত্ব দান করেন তবে তিনি দীর্ঘ দিনের যৌবন লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এই প্রস্তাবে রাজী হইলে ইনি যৌবন ফিরিয়া পান। কিন্তু বহু বৎসর ভোগ করিয়া বুঝিলেন তাঁহার ভোগ পিপাসা একরূপই রহিয়াছে। ইহাতে তিনি বিষয় ভোগের সব বিজ্ঞানই বুঝিলেন এবং পুত্রকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া জরাবরণ করিলেন। মহারাজ

যযাতি পরম জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। বেদের বহু মন্ত্রের ইনি ঋষি। তিনি ভোগের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভোগের অতৃপ্তির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম জানিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া ছিলেন। তোমরাও সংসার জীবনে এই মহান্ সত্য অনুভব করিতে পারিবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই সাবধান হইয়া জীবনকে ধর্ম্মানুশীলনদ্বারা জ্ঞানময় ও শান্তিময় করিতে ত্রুটী করিবে না।

ভীষ্ম। পিতামহ ভীষ্মের কথা তোমরা জান। ইনি বাল ব্রহ্মচারী, ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ইচ্ছামৃত্যু এই মহাবীরের আয়ত্তে ছিল। ইনি শরশয্যায় তিনমাস কাল অবস্থান করিয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে দেহত্যাগ করেন। রক্তমাংসের শরীরে ইঁহার এই বীরত্ব স্মরণীয় বিষয়। ইনি এ বয়সেও পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ছিলেন।

মহাবীর কর্ণ। সূতপুত্র বলিয়া ইঁহার অখ্যাতি ছিল। এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও ইনি সমাজ প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মে, শৌর্য্যে, ত্যাগে ও দানে সেই যুগের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আজকাল দেখা যায় অনেকে নিজেকে হীন প্রতিষ্ঠ মনে করিয়া খৃষ্টান বা মুসলমান হইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য ইহা দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠার কোনই উন্নতি হয় না। তাহার সমাজও উন্নত হয় না। চিরজীবন সে নিজেকে আরও হীন প্রতিষ্ঠই মনে করে। সমাজ জীবনের সংঘর্ষকে যদি ইহারা কাজে লাগাইতে পারে তবে একজন যে কোন পতিত সমাজকে অতি উচ্চ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আমরা প্রত্যেক অনুন্নতকে ভাব প্রবণতা ত্যাগ করিয়া ও পৌরোহিত্যবাদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিজের সমাজকে শক্তিশালী সমাজের অঙ্গরূপে পরিণত করিতে এবং মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে সেই শক্তিশালী অঙ্গে টানিয়া আনিতে বলি। ইহা দ্বারা হিন্দু সমাজের যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে উহা শেষ হইবে। এবং ইহা দ্বারা তোমরাও সমাজে বিশেষ সম্মানযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। তোমাদের কি প্রয়োজন যে অন্যের নিকট বড় প্রতিষ্ঠা চাও? যে শক্তিশালী, সে বড় হইবেই। তোমরাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সংস্কার গ্রহণ কর না? তোমাদিগকে আটকায় কে? তোমরা তো হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড শাখা। তোমরাও ত্যাগ, তপস্যা, যোগ, নিষ্কাম কর্ম্ম ও দানদ্বারা নিজ অংশকে মহিমাময় কর। এ সব উচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিয়া অনেককে ছলনা করিতেও দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের পদবী গ্রহণ করিয়া উচ্চবর্ণের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের মধ্যে ছলনা করিয়া বিবাহ বন্ধনের চেষ্টা কখনও সমর্থনীয় নহে। গোয়ালারা 'ঘোষ' পদবী গ্রহণ করিলেও কায়স্থ 'ঘোষ'দের সঙ্গে ছলনা করিতে শুনা যায় নাই। মনে রাখিও, ছলনা কখনও সমাজকে উন্নত করিতে সাহায্য করে না। একই পদবী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে যুগযুগান্তর ধরিয়া বিদ্যমান; কিন্তু কোথাও ছলনার অনুষ্ঠান হয় নাই। জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য অনেকে অনেক সময় আত্মগোপন করিয়াছেন, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে ছলনা কখনও সমর্থনীয় নহে, বরং দণ্ডনীয়।

মহাবীর কর্ণ আত্মপরিচয় গোপন করিয়া মহর্ষি পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। একদিন মহর্ষি কর্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন। এক গোবরে পোকা মাটীতে গর্ত্ত করিতে করিতে কর্ণের উরুস্থান ছিদ্র করিয়া ফেলিল। গুরুর নিদ্রায় ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া কর্ণ উরু সরাইলেন না। রক্তধারা মহর্ষির শরীর স্পর্শ করিয়া মহর্ষির নিদ্রা ভঙ্গ করিল। মহর্ষি জাগিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন এইরূপ বীরত্ব ব্রাহ্মণ সন্তানে সম্ভব নহে। মহর্ষি তাঁহাকে শাপ দেন যে মৃত্যুকালে তাঁহার রথ মাটিতে ধ্বসিয়া যাইবে। কর্ণের মৃত্যুকালে তাহাই ঘটিয়াছিল। গুরুসেবার এইরূপ অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার আদর্শের কথা ভাব। শক্তিবাদী গুরু ও শক্তিবাদী শিষ্য মিলনে যাহা সম্ভব হয় উহা দ্বারা মানুষের সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন, ধর্ম্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার হয়। কর্ণের জীবনের প্রত্যেকটী অংশ অপূর্ব্ব বীরত্ব, ত্যাগ, শৌর্য্য ও সহিষ্ণুতাময় এবং চমৎকার।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের বীরত্ব, ত্যাগ, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশল সমস্ত মহাভারতের মণি। মহাভারতের যুদ্ধ এক ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে নানা প্রকারের অদ্ভুত অস্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছিল। অর্জ্জুনের নিকট 'পাশুপৎ' প্রভৃতি এক এক ভীষণ ভীষণ শক্তিশালী অস্ত্র ছিল। উহাদের একটী মাত্র অস্ত্রের এত বল ছিল যে অর্জ্জুন শুধু

এইরূপ একটী অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ বিজয়ী হইতে পারিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, অর্জ্জুন উহা প্রয়োগ করেন নাই। 'পাশুপৎ' অস্ত্রকে শিবের অস্ত্র বলা যায়। শিব পারদ ধাতুর দেবতা। কাজেই মনে হয় পারদ নিহিত শক্তিকণায় ইহা নির্ম্মিত ছিল। বিগত মহাযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের উপর "এটম্ বম্ব" প্রয়োগ করিয়া বর্ব্বরতার চরম অনুষ্ঠান দেখাইয়া জাপানকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। এইরূপ ঘটনায় তোমরা সহজেই বুঝিতে পার এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের বর্ব্বরতার মনোবৃত্তি কিরূপ জঘন্য স্তরে আসিয়া নামিয়াছে। ইহারা আজও ঐ বর্ব্বরতার গভীরতা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই আমাদের মত মহান্ জাতির উত্থান ও শক্তিলাভ পৃথিবীর মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি অর্জ্জন করিবে, কিন্তু উহার বর্ব্বরের মত প্রয়োগ করিবে না। অর্জ্জুন আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

গুরু গোবিন্দ। ইনি ভাববাদী শিখ (শিষ্য) সম্প্রদায়কে এক শক্তিবাদী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। মুসলমান শাসকগণের বর্ব্বরতা ও অত্যাচার এই মহাপুরুষের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ইনি শিখ সম্প্রদায়কে এক শক্তিশালী যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। আজকাল এই পৃথিবীতে ইহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এই বীর মহাপুরুষের দুই পুত্র ছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালে গাঁথিয়া মারেন এবং বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন দেখান, কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ, এই বর্ব্বরতা দেখিয়া শিষ্যরা একদিনও ভয় পান নাই। অনুন্নত হিন্দুগণ যদি ঐ বীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর তবে তোমরাও এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। গুরু গোবিন্দজন্মোৎসব কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুস্থানের জন্য শিষ্যদের আশ্চর্য্য ভালবাসা। বর্ণ হিন্দুরা ইঁহাদের জল স্পর্শ করে না; কিন্তু ইঁহারা সেজন্য মোটেই ক্ষুব্ধ নহেন। আত্ম বিশ্বাস ও শক্তিমত্তা যাঁহাদের থাকে তাঁহারা মনুষ্যত্বের উপাদান বিশিষ্ট মানুষই হন। মহাত্মার নির্দ্দেশে মানুষ মহান্ মানুষ হয়। এবং পশুতুল্য গুরু হইলে সমাজ পশু তুল্য হয় এবং নপুংসক গুরু সমাজকে নপুংসক করেন।

প্রতাপসিংহ। এই মহান্ পুরুষ এই পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কিরূপ ভীষণ আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও কঠোরতার মধ্য দিয়া ইনি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন তোমরা উহা 'রাজস্থান' ইতিহাসে জানিয়া লইবে।

শিবাজী। ইনি 'রামদাস স্বামী' নামক এক মহাতপস্বীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় এই বীর পুরুষ মহারাষ্ট্রদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তোলেন। আওরঙ্গজেবের বর্ব্বরতার যুগ ভাঙ্গিবার মূলে এক দিকে শিষ্য-সম্প্রদায় ও অন্যদিকে মহারাষ্ট্রীয় বীরদের আত্মত্যাগ বিশেষ কারণ হইয়াছিল। এই মহান্ জীবন চরিত্র হইতে আমরা ভালভাবেই ইহা শিক্ষা করিতে পারি যে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে বর্ব্বরতার যুগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া কঠিন নহে, বর্ব্বরতার ভিত্তি হইতে সভ্যতার ভিত্তি অনেক শক্তিশালী।

স্বামী দয়ানন্দ। ইনি আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদের সামনে স্থাপনা করিয়া যান। ইনি আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদকে ভাঙ্গিবার আধুনিক মহাত্মাদের অন্যতম। ইনি শুধু বেদকে ভিত্তি করিয়া এক সুন্দর ধর্ম্ম স্থাপন করেন। ইহাতে বেদের জ্ঞান ভাণ্ডার পৌরোহিত্যবাদিগণের মুষ্টির বাহিরে চলিয়া আসে। ব্যাস লিখিত বেদান্ত-দর্শন যেমন বেদের জ্ঞান ভাগের একটা সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসা গ্রন্থ, স্বামী দয়ানন্দজীও বেদের কর্ম্মকাণ্ডের একটা সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসা দেখাইয়াছেন। ব্যাসের মতে আকাশ, প্রাণ, ঈশ, হংস, তৎ, লিঙ্গ, ব্রহ্মা প্রভৃতি শব্দ একই ব্রহ্ম বাচক। স্বামী দয়ানন্দের মতেও ঠিক ঐরূপ রুদ্র, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা বাচক শব্দগুলি সবই একই ঈশ্বর বাচক বা ব্রহ্ম বাচক। তিনি অসীম পাণ্ডিত্যদ্বারা ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। তোমরা যখন বেদ পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে বেদের বহু বহু মন্ত্র স্বামীজীর মতের সমর্থন করিতেছে। প্রমাণ যথা -

"সর্ব্বে বেদা, যত্ পদামামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বানি চ যৎ বদন্তি"। ইত্যাদি

(উপনিষদের জ্ঞান অংশ উদ্ধৃত মন্ত্রে দেখ)

এই মহাপুরুষের প্রভাবে বৈদিক চিন্তা জগতে যে একটা যুগান্তর আসিয়াছে - ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মূর্ত্তি খণ্ডনের সহিত আমরা একমত নহি, আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরকে বুঝাইবার জন্য মূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। ইহা স্থাপনার দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শক্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা হইয়া থাকে।

স্বামী দয়ানন্দজী কেবল আর্য্য শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কুরান এবং বাইবেলের উপরও নিজের অভ্রান্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন। তোমরা উহা পাঠ করিলে আরব্য দার্শনিকতা ও ইহুদি দার্শনিকতা আমাদের বৈদিক দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদের তুলনায় কত নিম্ন স্তরের উহা বুঝিতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ। ইনি আমাদের নিকট এবং এই পৃথিবীর নিকট অত্যন্ত পরিচিত মহাত্মা। এঁর তেজস্বিতা, যুক্তিবাদ, ত্যাগ ও স্বদেশ প্রেম তোমরা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। ইনি চিকাগো ধর্ম্মসভায় অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ করেন যে হিন্দুধর্ম্মই প্রকৃত 'মানব' ধর্ম্ম। ইনি পশ্চিম দেশে আমাদের হিন্দুর জ্ঞানবাদের প্রচার এবং আমাদের দেশে পশ্চিমের কর্ম্মবাদের প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলতঃ তিনি ইহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী - "যদি পশ্চিম হিন্দুর জ্ঞান ও দার্শনিকতা গ্রহণ না করে তবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।" অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তিনি আমাদের দেশে পশ্চিমের কর্ম্মবাদ প্রতিষ্ঠার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে মোটেই এক মত নহি। ভ্রান্ত দার্শনিকতার ভিত্তিতে ভ্রান্ত কর্ম্মবাদ অভ্রান্ত দার্শনিকতার ক্ষেত্রে ভারতের কোন কল্যাণ করিতে পারে না। আমরা নিজেদের কর্ম্মবাদ নূতন ভাবে সংস্কার করিয়া লইবার পক্ষপাতী। তিনি রামকৃষ্ণকে অবতার করিবার চেষ্টা করিবার দরুণ রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তিত সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়বাদ আমাদের দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে আমাদের মধ্যে ইস্‌লাম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আসল ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বাধা পায় এবং সমাজ জীবনে আমরা নানা প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ি। ইহা ভিন্নও অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টানগণ বিনা বাধায় ধর্ম্ম প্রচারের পথ পায়। অশিক্ষিতগণ খৃষ্টান হইতে চলিলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত মিশনবাদিগণ আজ পর্য্যন্ত উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। হিন্দুরা অহিন্দু বর্ব্বরতাদ্বারা নির্য্যাতিত হইতে থাকিলে উহার প্রতিকার বা প্রতিশোধেও মিশনবাদীদের সাহায্য পাওয়া যায় না। কয়েকটি সিদ্ধান্তে একমত না হইলেও তিনি আমাদের পূজ্য মহাপুরুষ।

সতী। এবার আমরা নারী মহাত্মাগণের কথা বলিব। আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু নারী মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদেরও সংখ্যা পুরুষদের মতই অসংখ্য। বেদের অনেক সুন্দর সুন্দর মন্ত্রের ঋষি নারী। আমরা এখানে প্রথম সতীর কথাই বলিব।

সতীর অন্য নাম 'উমা'। ইনি মহারাজ দক্ষের কন্যা ছিলেন। শিবের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ও উমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। উমা কিন্তু ইহাতে বিরত হইলেন না। তিনি পিতৃগৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং শিবের অনুমতি চাহিলেন। উমা চিরদিনই একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। তোমরা এই ঘটনাকে একেবারে লীলা মনে করিও না। এক যুগে সত্য সত্যই আমাদের দেশে এইরূপ স্বভাব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের চরিত্র এমনই সুন্দর ও মহান্ ছিল যে আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে বাসিতে দেবতা ও ঈশ্বরে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। কৃষ্ণ, রাম ও বুদ্ধকে আমাদের মধ্যে অনেকে এত ভালবাসেন যে তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে ইঁহারা ঈশ্বর নহেন। এক যুগে যাঁহারা আমাদের দেশের রাজা বা নেতা ছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারা আমাদের মনের মধ্যে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

একটু একরোকা বুদ্ধি থাকিবার কারণ, উমা যদি কোন কথা একবার মনে মনে আঁটিয়া বসিতেন তবে কাহারও শক্তি ছিল না যে তাঁহাকে নিরস্ত করে। তিনি পিতার নিতান্ত অনিচ্ছায় স্বয়ম্বর সভায় শিবকে নিজের পতিত্বে বরণ করেন। উমা কোন দিনই ভোগ বিলাসে মগ্ন ছিলেন না। তিনি পাহাড়, পর্ব্বতে, বনে, জঙ্গলে, তপস্যা ও সাধনা করিবেন ইহাই তাঁহার অত্যন্ত কাম্য ছিল। তাই তিনি শিবকেই বাল্যকাল অবধি পতি করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শিবকে পতি বরণ করিবার দরুণ ইনি পিতার অপ্রিয় হন। এখানেও তিনি ভাবিলেন, বাবার নিকট যাইব, তাহাতে নিমন্ত্রণের আবার প্রয়োজন কি? আসল কথা তাঁহার বাবা, মা, ভাই, বোন, দাস,

দাসীদের স্নেহে টান পড়িয়াছে। কাজেই তিনি যাইবেন দৃঢ় সংকল্প হইলেন। এবং এই অবস্থায় যাওয়াটা অন্যায় হইবে ভাবিলেন না। উমার জেদ্, যাইবেন এবং শিবেরও আদেশ লইবেন।

উমা কঠোর তপস্বিনী ছিলেন। নিজের তপঃশক্তি প্রয়োগ দ্বারা শিবকে আদেশ দিতে বাধ্য করিলেন। শিব বুঝিলেন, ইনি অনাদি মহাশক্তি। উমা দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া নিজের অসীম তপঃশক্তি প্রকট করিলেন। জীব মাত্রই যে অনাদি মহাশক্তি বা পরমব্রহ্ম, ইহা জ্ঞানের শেষ প্রান্তে বুঝা যায়। উমা তপস্যা ও সাধনার বলে সেই শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যে কোন নরনারীই জ্ঞানের এই সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। শিব বুঝিলেন, উমা আর সহজ মেয়ে নাই কাজেই যাইতে অনুমতি দিলেন।

উমা যজ্ঞ মণ্ডপের নিকটস্থ হইবা মাত্রই মহারাজ দক্ষ তাঁহাকে তিরস্কার এবং শিবকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পতি তাঁহার এতই প্রিয় ছিলেন যে এই ভর্ৎসনা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অসহ্য হইল; তিনি সেই স্থানেই দেহত্যাগ করিলেন।

একজন শক্তিবাদী ব্রহ্মবিদুষী নারীর চরিত্র কিরূপ হইতে পারে ইহা আমরা উমার চরিত্রে পূর্ণ ভাবেই দেখিতে পাই। তিনি জ্ঞানী ও মহাশক্তিশালিনী হইয়াও ঠিক একজন সাধারণ কন্যার মত পিতার বাড়ী যাইবার জন্য জেদ্ ধরিলেন। পিতার নিকট আসিয়া সাধারণ সতী মহিলার মত তাঁহার স্বভাব দেখা দিল। একাধারে অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক জ্ঞান, অন্যদিকে সাধারণ জীবের মত মনের গতি। ইহা আমরা সমস্ত বড় বড় মহাপুরুষ ও ব্রহ্ম বিদুষী কন্যাগণের চরিত্রে দেখিতে পাই। অসীমরূপে নিজেকে জানিবার পরও জীবত্বের সবটুকু মাধুর্য্য যিনি নিজের চরিত্রে অকৃত্রিম ভাবে ফুটাইয়া লইয়াছেন তাঁহাকেই মানুষ ঈশ্বর ও দেবতা জ্ঞানে নিজের মনের কোনে স্থান দিয়াছে। সতীর চরিত্রের মত এমন সুন্দর চরিত্র হিন্দু জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

সতীর দেহত্যাগের ভীষণ দুর্ঘটনা মুহূর্ত্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। উমার সাথী নন্দী এই খবর শিবকেও প্রদান করিল। শিব সদলবলে যজ্ঞ স্থলে চলিয়া আসিলেন। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হইল। শিব উমার মৃতদেহ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। দক্ষ সেই সময় এদেশের সম্রাট ছিলেন কাজেই দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এই খবর ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করিল। শিব উমাদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। কাজেই আন্দোলন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। তখন দেবতাগণ ইহার প্রতিকারে উপায় স্থির করিলেন। বিষ্ণু শিবের পেছনে পেছনে থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের চক্রদ্বারা উমার মৃতদেহ শিবের অলক্ষ্যে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। যে স্থানেই উমার দেহের খণ্ড পতিত হইয়াছিল সেই সব স্থানই আজ তীর্থ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তোমরা ৫১ পীঠ স্থানের কথা শুনিয়াছ। এই ৫১ পীঠ স্থান কেবল ভারতের মধ্যেই অবস্থিত নহে। ইহা ভারতের বাহিরেও অবস্থিত। এই সব পীঠস্থানে উমার দেহ অংশ পতিত হইয়া ছিল।

যাহারা সতী প্রথাকে অসভ্য মনে করে তাহারা ভোগ লিপ্সাটাই বুঝে; কিন্তু ভালবাসা, প্রেম, তপস্যা, সাধনা, ব্রহ্মজ্ঞান এবং শক্তি লাভ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ। আজও আমাদের দেশে কত নারী পতির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ত্যাগ করিতেছেন, শুনা যায়।

আমরা উমাকে যে কত ভালবাসি, তাঁহার জীবন ও আদর্শকে কত উন্নত করিয়া রাখিয়াছি উহা তীর্থগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। তোমরা দুর্গা পূজায় মন্ত্রে দেখিবে "ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী-কোটী-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" অর্থাৎ যিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশের কারণ, যিনি কোটী যোগিনী পরিবৃতা (অর্থাৎ যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কোটি কোটি শক্তিকণা ক্রিয়াশীল আছে), যিনি ভদ্রকালী স্বরূপা (কালচক্র যখন আসুরিক প্রভাব মুক্ত হইয়া আমাদের অনুকূল হয় সেই কাল বা সময়ই মঙ্গলময় কাল; এইরূপ কালই ভদ্রকালী), যিনি ওঁ স্বরূপা (ব্রহ্মস্বরূপ) এবং হ্রীং (মহাশক্তি) স্বরূপা, তাঁহাকে প্রণাম।

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মশক্তির প্রভাব নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিরূপে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। এইরূপ মহান মানবের স্মরণ ও ব্রহ্মস্মরণ একই বস্তু। পূজামন্ত্রে এই দক্ষ যজ্ঞবিনাশিন্যৈ অংশে যে শ্রদ্ধা, যে উচ্চ ধারণা উমার উপর অর্পিত হইয়াছে, উহা একটুও অন্যায় হয় নাই।

উমার তপঃশক্তি, ত্যাগ, সাধনা, পতিপ্রেম পিতৃপ্রেম সব মিলাইয়া উমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাগণও এইরূপে নিজেদের কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি দ্বারা আজ ঈশ্বর রূপে পূজনীয় হইয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয় উমার মত স্থান কেহই পান নাই। উমা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রত্যেক নরনারীর আদর্শ মূর্ত্তি। তোমরা দ্রৌপদী ও রাজস্থান মহিলাদের জীবন চরিত্রে এই মহান আদর্শই দেখিতে পাইবে।

তোমরা যদি হরিদ্বারে যাও তবে উমার বিবাহের কুশণ্ডিকার অগ্নি আজও দেখিতে পাইবে। এই অগ্নি এখন "ত্রিযুগী নারায়ণ" বলিয়া খ্যাত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগে বিদ্যমান বলিয়া ইনি ত্রিযুগী নারায়ণ। তোমরা এ সব ঘটনাকে গল্প মনে করিও না। এইসব ঘটনা আমাদের সত্যই ঘটিয়াছিল।

একযুগে শক্তিশালী নরনারীগণকেই আমরা পরবর্ত্তী যুগে দেবতা ও ঈশ্বর-প্রতীকরূপে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। তাঁহাদের চরিত্রের সঙ্গে আমাদের শরীরস্থিত ব্রহ্মনাড়ী, উহার শাখা প্রশাখা ও মর্ম্মকেন্দ্র প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া লইয়া আমাদের জীবনকে মহান করিয়া লইয়াছি। ইহা মোটেই অন্যায় হয় নাই। কারণ বীরত্ব, শান্তি, ত্যাগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি উন্নত চরিত্রের উপাদান আমাদের শরীরে ও মনেই বিদ্যমান আছে। বিচার করিলে দেখা যায় যাঁহারা ত্যাগ ও বীরত্বে মহান হইয়াছেন তাঁহাদের শরীর স্থিত ঐ সব মর্ম্মাংশই ঐরূপ মহান হইতে সাহায্য করিয়াছে।

মহাশক্তি বা ব্রহ্মের লীলারূপই এই জগৎ। এই জগতের যে সব স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ব্রহ্ম-বিদুষীগণের শক্তি মাধুর্য্য হইয়াছে সেই সব স্থানের মাহাত্ম্য একটু বেশী হইবারই কথা। মহামায়ার লীলাকথার এক সুন্দর গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি - হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এক মহাতপা সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই 'মায়া' দেখিবার জন্য পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব ঘটনাই একজন সিদ্ধ জ্ঞানীর নিকট যে মায়া বিশেষ, উনি ইহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া 'মায়া দেখিবার' প্রার্থনা করতে লাগিলেন।

একদিন সন্ন্যাসী গঙ্গার তীরে বর্হিবাস ও কমণ্ডলু রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময় এক কুমীর তাঁহাকে গ্রাস করিল। কিছুক্ষণ বাদ দেখিলেন তাঁহার আত্মা এক বেদেনীর গর্ভে প্রবেশ করিল। পরে যথা সময় তাঁহার জন্ম হইল। তিনি বেদেনীর কন্যা হইয়া জন্মিলেন। কন্যার বয়স হইল। বিবাহ হইল। গঙ্গার ধারেই এক বেদের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। এক এক করিয়া ৪টী সন্তান হইল। সন্ন্যাসীর আত্মা এ সব কাণ্ডে বেশ মত্ত হইলেও তিনি সবই দেখিতে ছিলেন। একদিন বেদেনী গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে কুমীর তাহাকে গ্রাস করিল। কুমীর তাহাকে গঙ্গার অন্য পারে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন তিনি আর বেদেনী নাই। সেই সন্ন্যাসীই আছেন। তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলেন এবং দেখিলেন সেই কমণ্ডলু ও বহির্বাস সেই স্থানেই রহিয়াছে। তিনি গা মুছিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এ কিরূপ ঘটনা! এতকাল কাটিয়া গিয়াছে, সেই কাপড়, সেই কমণ্ডলু। আরও ভাবিতেছেন, বেদেনী হইয়া তাঁহার একটা জন্মের কথা। ঠিক এমন সময় বেদে আসিয়া বলিল; মহারাজ, বলুন, আমার বেদেনী কোথায়? সন্ন্যাসী যতই জবাবকে উপেক্ষা করিতে ছিলেন, বেদে তাঁহাকে ততই ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শেষ কালে সন্ন্যাসী বলিলেন - তোমার বেদেনীর কথা আমি আর কি বলিব, আমিই তো তোমার বেদেনী, কিন্তু আমার সে জন্ম শেষ হইয়াছে। তুমি আমাকে আর পাইতে পার না। বেদে বলিল - আমি আর আপনাকে পাইতে চাই না। কিন্তু সন্তানগুলি অত্যন্ত ছোট, আপনি উহাদিগকে যাইয়া দেখুন। একটু বড় হউক, পরে আপনি চলিয়া আসিবেন। নতুবা আমার কাজকর্ম্ম সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। ছোট ছোট বাচ্চা, ওদের না দেখিলে আমি কিছুতেই উহাদিগকে বাঁচাইতে পারিব না। সন্ন্যাসীর সব যুক্তিই বেদে কাটিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ন্যাসী কাঁদিতে লাগিলেন। বেদে তাতেও ছাড়ে না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসী মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আরও কাঁদিতে লাগিলেন - "হে পরমাত্মা একি তোর মায়া!" এই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসী ঘুমাইয়া পড়িলেন। জাগিয়া দেখেন, বেদে বা বেদের ডেরা কোথাও কিছু নাই।

বুঝিলেন ইহাই মায়া। তোমরাও যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর তবে বুঝিতে পারিবে এই জীব জগৎ রূপে সেই মহাশক্তি বা ব্রহ্ম কিরূপ অস্তিত্বহীন এক লীলা জুড়িয়া বসিয়াছেন।

গার্গী। ব্রহ্মবিদুষী গার্গীর নাম তোমরা হয় তো জান। ইঁনি মহামুনি গর্গের কন্যা ছিলেন। ইঁহার লিখিত ঋগ্বেদের ভাষ্য এখনও বিদ্যমান। মহারাজ জনকের সভায় ইনিই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বালোচনায় খ্যাতি লাভ করেন। চণ্ডী পাঠ কালে যে দেবীসূক্ত পাঠ হইয়া থাকে (ঋগ্বেদের ১০ম্ মণ্ডল॥ সূক্ত ১২৫) এই সূক্তটীর ঋষিও একজন নারী। ঐ মহতী বিদুষীর নাম 'বাঙ্'। ইনি অভৃঙ্ ঋষির কন্যা ছিলেন। ইহা শক্তিস্তরের অনুভূতিজ্ঞাপক মন্ত্র। আমাদের দেশের কন্যাগণ উচ্চ বিদ্যার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ইহা ভাবিতে আনন্দ হয়। আমরা তাহাদিগকে সতী গার্গীর কথা স্মরণ করিতে বলি। এবং নিজস্ব কৃষ্টিতে শ্রদ্ধা রাখিতে বলি।

রাধিকা। আমাদের বর্ত্তমান সমাজজীবনে এই মহিলার খুবই সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতে এই মহিলার কথা আছে। ইনি বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া ছিলেন। স্বামীকে সতী স্ত্রী যতটা আত্মদান করিয়া ভালবাসেন তাঁহার ভালবাসা ততটা গভীর ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য রাধিকার ভালবাসা কোন দিনই কাম ও সৃষ্টির দিকে যায় নাই। এই ভালবাসা ভালবাসাই ছিল এবং এই ভালবাসা রাধিকাকে ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মবিদুষী মহিলাতে পরিণত করে। প্রত্যেক বালিকাতে ৮ বৎসর বয়সে ভালবাসার অঙ্কুর জন্মে। এই অঙ্কুর ১৬ বৎসরে পরিণত ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়। পরে উহা বহির্মুখী হয় ও সৃষ্টির দিকে ধাবিত হয়। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্ম নাড়ীর মধ্যে সত্য, প্রেম, সুখ, শান্তি, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, এ সব কেন্দ্র বিদ্যমান থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রেম বহির্মুখী হইলেই যৌবন লক্ষণ দেখা দেয়। এই যৌবনকে সংযত রাখিয়া ব্রহ্ম নাড়ীতে মন একাগ্র করিতে পারিলে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। রাধিকার জীবনে আমরা যাহা দেখিতে পাই, উহা আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে, ভালবাসাই সংযম এবং ভালবাসাই ব্রহ্মচর্য্য এবং ভালবাসাই এক আশ্চর্য্য তপস্যা। ভালবাসা যদি ঈশ্বরে বা ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষে অর্পিত হয় তবে সেই ভালবাসা ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান ও সংযমেরই ফল দান করে। রাধিকার জীবনে আমরা সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্টই দেখিতে পাই; কিন্তু উমার মত তেজস্বিতা ও শক্তিমত্তা দেখিতে পাই না।

শবরী। এই তপস্বিনী ব্রহ্মবিদুষীর কথা রামায়ণে আছে। এঁর স্নেহময় ভালবাসা ইঁহাকে ঋষিত্বে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। ইনি ত্রিকালদর্শী ছিলেন। ইনি ভীলকন্যা (অছুঁত) ছিলেন। বাল্যকালে শ্রীরামের কথা শুনিয়া রামের উপর ইঁহার আকর্ষণ হয়। যৌবনে পিতা বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলে ইনি তাহাতে অমত করেন। ইনি নিত্য ফল, মূল ও পুষ্প চয়ন করিয়া রামের জন্য অপেক্ষা করিতেন। এঁর একনিষ্ঠ ভক্তির বিস্তারিত কথা জানিলে তোমাদের চক্ষে জল আসিবে। ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে রামের দর্শন পান। রামকে কোলে লইয়া ইনি আহার করাইয়া ছিলেন। রাম ও শবরীর মিলন অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনার পর ইনি শরীর ত্যাগ করেন। ভালবাসা আজকাল আমাদের সমাজে কামজ ব্যাধিরূপে প্রবেশ করিয়া সমাজের ক্ষতি করিতেছে। প্রকৃত ভালবাসা ঈশ্বরেই সম্ভব এবং উহাই ব্রহ্মচর্য্য। এই সঙ্গে তেজ, বীরত্ব ও কর্ম্মশক্তি থাকিলে জীবন মহান হয়।

দেবতা উপাসনা

দেবতা বলিতে কি বুঝা যায় উহা তোমাদের জানা প্রয়োজন। আমাদের মনের মধ্যে নানাপ্রকার দৈব বৃত্তির উদয় হয়। এই সব দৈব বৃত্তিই দেবতা। যেমন, দান করিবার ইচ্ছা; উপকার করিবার ইচ্ছা; ত্যাগ করিবার ইচ্ছা; কোন দুষ্ট, চোর, গুণ্ডা বা অসুর অত্যাচার করিতেছে, উহার প্রতিশোধ ইচ্ছা, ইত্যাদি। এই মনোবৃত্তিগুলিকে দৈব ভাব বা দেবতা বলে। আমাদের মনে চুরি, চালবাজী, মিথ্যা, ছলনা, গুণ্ডামী, বর্ব্বরতা এবং অন্যের অনিষ্ট করিবার কুমতলব উদয় হইলে উহাদের নাম হয় 'আসুরিকতা'। গীতা পড়িলে তোমাদের এই ভাব আরও স্পষ্ট হইবে। গীতার ২৬টী প্রধান দৈবভাব ও ৫টী প্রধান আসুরিক ভাব-এর উল্লেখ আছে। দৈবীভাব অবলম্বন করিলে তাঁহাদের নাম হয় দেবতা, আসুরিক ভাব অবলম্বন করিলে তাহাদের নাম হয় অসুর।

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, যোগ ও জ্ঞান নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (বেদাদি অভ্যাস), তপঃ, সরলতা, অহিংসা (অন্যের অনিষ্ট করিবার নাম হিংসা), সত্য, অক্রোধ, শান্তি, অপৈশুন (চুগলী খোড়ি না করা), দয়া, নির্লোভিতা, ধীরতা, লজ্জা প্রবণতা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অক্রোধ, অবৈরিতা (ঈর্ষা হীনতা), নিরভিমানিতা - ইহাই দৈব সম্পদ। ইহাদের মধ্যে ৫টী প্রধান যথা- অভয়, তেজ, সত্য, প্রেম (অহিংসা) ও শান্তি। এই পাঁচ দৈবভাবকে যদি তোমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পার তবে তোমাদের জীবন সব দিক দিয়া ঠিক পথে পরিচালিত হইবে।

৫টী আসুরিক সম্পদ যথা - দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও পারুষ্য। দৈবীভাবগুলি জ্ঞান, ত্যাগ ও যুক্তিবাদ মূলক। আসুরিক ভাবগুলি অহংকার, স্বার্থ, যুক্তিহীনতা ও অজ্ঞানতা মূলক।

অভয় ও সত্য কিরূপ শক্তিশালী বস্তু উহা তোমরা কিছুদিন অভ্যাস দ্বারা বুঝিতে পারিবে। মনে রাখিবে, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের বিষয়। একবার নির্ভীক হও, দেখিতে পাইবে, আরও একবার নির্ভীক হইবার শক্তি আসিয়া গিয়াছে। বেদ হইতে অভয় সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর মন্ত্র লিখিতেছি। যথা -

১। যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ববেদ কাণ্ড ২ ॥ সূক্ত ১৫। মন্ত্র ১॥

যেমন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নির্ভীক এবং কখনও কক্ষচ্যুত হয় না সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভয় হও।

২। যথা হশ্চ রাত্রীচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ব কাণ্ড ২। সূক্ত ১৫। মন্ত্র ২॥

যেমন দিন এবং রাত্রি নির্ভীক এবং কখনও কক্ষচ্যুত হয় না অর্থাৎ অটল, সেইরূপ হে আমার প্রাণ, নির্ভীক হও।

৩। যথা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ব কাণ্ড ২॥ ১৫। ৩॥

যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ভীক এবং কখনও কক্ষচ্যুত হয় না, ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

৪। যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রংচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ব কাণ্ড ২॥ ১৫। ৪॥

যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ও বীর যোদ্ধা, নির্ভীক ও অটল, সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

৫। যথা সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ব ২॥ ১৫। ৫॥

যেরূপ ব্রহ্ম এবং মায়া নির্ভীক এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অটল ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

৬। যথা ভূতংচ ভব্যংচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ অথর্ব্ব ২॥ ১৫। ৬॥

যেরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ভীক (অর্থাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা কিছুতেই বদলানো যায় না এবং যাহা হইবে তাহাও রুদ্ধ করা যায় না, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া হইয়া যায়) সেইরূপ আমার প্রাণ নির্ভীক হও।

অহিংসা বা প্রেম। সকলের সহিত সমভাবই ও সমব্যবহারই প্রেম। তুমি যেমনটী অন্যের নিকট পাইতে ইচ্ছা কর ঠিক তেমনটী অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। ইহার নাম প্রেম। যদি দেখিতে পাও একজন তোমার নিকট ভালটী ও সুবিধাটী আশা করে কিন্তু প্রতিদানে দুর্ব্যবহার ও অবিচার মানাইয়া লইতে চায় তখনই সাবধান হইবে; কারণ ইহা আসুরিক লক্ষণ। ধর্ম্মের নাম করিয়া বা অন্য কোন বাহানা করিয়া যে তোমার নিকট ভালটি আদায় করিয়া মন্দটি দিতে চায় তাহাকে অত্যন্ত শয়তান প্রকৃতির অসুর জানিবে। এবং কোন প্রকারের সুবিধা দানের কথা বাতিল করিয়া দিবে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে অহিংসার নামে মিথ্যা ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী নেতাগণ এমন সব অনীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন যাহা দ্বারা হিন্দুদের ন্যায্য অধিকারে হিংসা করা হইয়াছে এবং অহিন্দুদের আসুরিক দাবীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। যোগ শাস্ত্রে বলিয়াছে, "অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিকট কাহারও বৈরিতা থাকে না।" কিন্তু তোমরা যদি লিগ ও কংগ্রেস নীতি আলোচনা কর তবে দেখিতে পাইবে কংগ্রেস ও গান্ধীর উপর লিগের বৈরিতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তোমরা নিজের বা কাহারও উপর অবিচার করিয়া কাহারও তোষণ করিলে উহাও হিংসাই হইয়া থাকে। হিংসার ফল বৈরিতা। অহিংসার অর্থ অনীতির প্রশ্রয় নহে।

শান্তি। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপাসনায় শান্তি লাভ হয়। নিত্য যথাসময় ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী হইবে। ইহা দ্বারা শান্তি বৃদ্ধি হইবে।

তেজ। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈবী সম্পদ। যাহারা অসুর, বদমায়েস, গুণ্ডা, ইতর ও নীচ প্রকৃতির মানুষ তাহাদের দমনের জন্য শক্তি অর্জ্জনই 'তেজ'। পূর্ব্বে কর্ম্ম-ধর্ম্ম শীর্ষক অধ্যায়ে শক্তিশালী, দুর্ব্বল ও আসুরিক তিন প্রকারের কর্ম্মলক্ষণের কথা বলিয়াছি। এই দৈবী ভাব অধ্যায়েও তোমরা তিন প্রকারের মনোভাব দেখিতে পাইবে। আসুরিক, দুর্ব্বল ও শক্তিশালী। তেজহীন দৈবী ভাব মাত্রই দুর্ব্বল মনোবৃত্তির লক্ষণ জানিবে। তেজহীন মানুষ ভীরু হইয়া থাকে এবং এই ভীরুতার দরুণ সত্যকথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না। তেজহীনতা সমস্ত প্রকার দৈবী ভাব গ্রহণে অযোগ্য প্রস্তুত করে। একদল জাতীয়তাবাদী নেতা আমাদের অহিংসার তত্ত্ব না জানিয়া অহিংসার নামে নিস্তেজবাদ আনিয়া দিয়াছেন।

যাহারা দুর্ব্বল, অসুর এবং অসুরের সমর্থক তাহারা তেজস্বীকে ক্রোধী বলিতে চেষ্টা করিয়া নিজেদের মূর্খতা, দুর্ব্বলতা বা স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। তোমরা খুব বিবেকের সহিত বিচার করিবে এবং দুর্ব্বলদের কথায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। তেজস্বীরা নিশ্চয়ই সংযতভাষী হইবে। সমস্ত বেদে এবং গীতা আদি উচ্চস্তরের ধর্ম্মগ্রন্থে দুষ্ট ও আসুরিকদের বিরুদ্ধে সাবধানতা ও বিরোধিতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। এবং অন্ন, বস্ত্র, ধনবৃদ্ধি ও সমাজ রক্ষার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ ৫টী দৈবী সম্পদের মর্ম্মকথার মধ্যে - সুবিচার ও আসুরিকবিরোধিতাই আসল নীতি, মনে রাখিবে।

দম্ভ। ইহা আসুরিক মনোবৃত্তি। মনে মনে নিজেকে একটা মোটা তাজা কিছু কল্পনা করিয়া লওয়া ও ব্যবহারে উহা স্পষ্ট হইলেও বুঝা যায় লোকটা 'দাম্ভিক'। ইহা মূর্খতা, কুশিক্ষা ও কুধর্ম্মমূলক অজ্ঞানবৃত্তি।

দর্প। ইহা দম্ভের পরিণতি। যতক্ষণ মনে ও বাক্যে মাত্র দাম্ভিকতা ততক্ষণ উহা দম্ভ। যে মুহূর্ত্তে আরও স্থূল কার্য্যক্ষেত্রে উহার পরিণতি বুঝা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে এবার 'দর্প' রূপ ধারণ করিয়াছে। অকার্য্য

কুকার্য্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাকে 'দর্প' বলা হয়। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষ অসুরের দর্পনাশ করিয়াছিলেন।

অভিমান। অহঙ্কারী লোক প্রেম হীন, বিনয় হীন, যুক্তি হীন ও স্বার্থপর হইয়া থাকে।

ক্রোধ। যাহাতে তোমার ন্যায়তঃ দাবী নাই, এমন বস্তু পাইবার বাসনা হইল, কিন্তু পাইতে বাধা যদি কেহ দেয়, সেই লোকই তোমার অপ্রিয় হইবে। এইরূপ অবস্থায় তোমার প্রতিশোধবৃত্তি মনে জাগিলেই উহা ক্রোধ বলা হয়। ক্রোধ এবং তেজ সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। কেহ অন্যায়ভাবে তোমার বা কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত শুধু কর্ত্তব্য জ্ঞানে বা নিঃস্বার্থভাবে তুমি বাধা দিলে; বা প্রতিশোধ লইলে; ইহা তোমার 'তেজ' বৃত্তি। ক্রোধী ব্যক্তি পশু তুল্য, তেজস্বী ঈশ্বর তুল্য।

পারুষ্য। মানে বর্ব্বরতা এবং নিষ্ঠুরতা। যুক্তি নাই, অধিকার নাই, হয় তো বা প্রয়োজনও নাই তবু লোককে বা সমাজকে পীড়ন ও অশান্তি দিবার অনুষ্ঠানের নাম বর্ব্বরতা। বর্ব্বর রাজারা শক্তিশালী পশু মাত্র। যাহারা নিজেরা বর্ব্বর তাহারা ঈশ্বরকেও বর্ব্বর প্রস্তুত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করে। এবং ধর্ম্মের নামে বর্ব্বরতা করে, ধর্ম্মের নামে বা 'ইজম' এর আবরণে এই পৃথিবীতে বর্ব্বরতা যথেষ্ট হইতেছে।

দেবতা বিজ্ঞানের ইহাই মূল বিজ্ঞান। এই পৃথিবীতে তাঁহারাই দেবতা হইয়াছেন, যাঁহারা উক্ত দৈবী ভাবগুলিকে নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন। যাঁহাদের চরিত্র জগৎমঙ্গলের অনুকূল এবং জগতের অমঙ্গলকারী অসুরদের বিরোধী তাঁহারাই দেবতা। সূর্য্য, চন্দ্র, নদী, বাতাস, অগ্নি শত শত প্রকারে আমাদের মঙ্গলের কারণ বলিয়া তাহারাও আমাদের দেবতা। যাহারা আসুরিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা পশুতুল্য। তাহারা এই সব মঙ্গল কর কারণগুলিকে কখনও দেবতা বলিয়া স্বীকার করে না। যদি তাহারা এসব বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করে তবে তাহাদের মনের আসুরিক বৃত্তি কমিয়া যাইবে। তাহারা এ জগতে আসিয়াছে গুণ্ডামি করিতে, কাজেই ইহারা কিছুতেই দেবত্ব মানিতে পারে না। তোমরা এ সব লক্ষণ দ্বারা মানুষ চিনিবে এবং সাবধানতা ও শক্তি অর্জ্জন করিবে।

সূর্য্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, হিমালয় আদিকে আমরা কেবল মঙ্গলময় 'প্রকৃতি' জ্ঞানেই দেবতা মনে করি না। তাঁহারা আমাদের অন্তরের বা শরীরের এক একটী মূল্যবান অংশ। যাহাতে এ সব মূল্যবান অংশগুলিকে আমরা সতেজ ও কর্ম্মঠ রাখিতে পারি এ জন্য নানা প্রকার প্রক্রিয়া যোগশাস্ত্রে এবং সন্ধ্যাপূজাদি বিধানে আছে। যেমন সূর্য্য = চক্ষু (optic nerve)। চন্দ্র = মন, গঙ্গা = ইড়ানাড়ী, যে নাড়ীতে জ্ঞানের প্রবাহ হয়। যমুনা = পিঙ্গলা। সরস্বতী = সুষুম্না। হিমালয় = সুষুম্না পথ সুশীতল এক প্রকার পদার্থে পূর্ণ থাকে, এ জন্য এই সুষুম্নার একটা অবস্থায় নাম হিমালয়। মেরুদণ্ডকে পর্ব্বত বলে। কতগুলি অস্থির পাব্ বা পর্ব্বে ইহা প্রস্তুত বলিয়া ইহার নাম পর্ব্বত। হিমালয় পর্ব্বত। সুশীতল সুষুম্না মার্গ = মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড বা হিমালয়ই সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি আদির আশ্রয়। কারণ ইহাতেই সবগুলি কেন্দ্র ও নানাপ্রকার উচ্চভাব পূর্ণ নাড়ীমণ্ডল বিদ্যমান। এই সব দেবতার উপাসনা অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে শরীরের সমস্ত মূল্যবান অংশগুলির সাহায্যে তোমাকে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে এবং উহাদের পবিত্রতাও রক্ষা তোমাকে করিতে হইবে।

নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও দেবতা সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট করিয়া লও। যথা - ব্রহ্ম নাড়ীই ব্রহ্মা বা আত্মা। তোমরা যতই বেদান্ত পাঠ কর না, যতক্ষণ যোগের ক্রিয়া দ্বারা মনকে ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করাইতে পারিবে না ততক্ষণ তোমাদের মনের অবস্থিত দৈন্য ভাব নষ্ট হইবে না। এই জন্য ব্রহ্ম নাড়ীই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই ব্রহ্ম নাড়ীর মস্তিষ্কস্থিত অংশে পাঁচটী কেন্দ্রই পাঁচটি সগুণ ব্রহ্ম যথা - গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং ইহাদের সমষ্টিই শক্তি বা দুর্গা।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, ইত্যাদিরা কোন্ দেবতা, ইত্যাদি প্রশ্ন মনে উঠিবে। বিষ্ণু স্তরের শক্তি = লক্ষ্মী। বিষ্ণু সমাজ পালনকারী খণ্ড ঈশ্বর। সমাজ রক্ষার জন্য অন্ন, বস্ত্র বা ধনের প্রয়োজন; এজন্য লক্ষ্মী বিষ্ণু শক্তিরই একটা অংশ। সরস্বতী = জ্ঞান শক্তি। ইনি শিবস্তরের শক্তি। বেদ বেদান্ত দর্শন যোগ তন্ত্রাদির সমষ্টি।

কার্ত্তিক = ইনি বীরত্বের প্রতীক; তেজরূপ দৈবী ভাব। ইন্দ্র = অসুর নাশক ও সুখের যুগ প্রতিষ্ঠাপক নেতা বা রাজার প্রতীক, ইহা 'তেজ' এর প্রতীক। প্রাণ = বায়ু। রুদ্র = মনের ও শরীরের উষ্ণতা। অগ্নি = তেজ, ক্ষুধা, জঠরাগ্নি।

তোমরা যখন ছান্দোগ্য উপনিষদ পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে বহুপ্রকারের উপাসনার উপদেশ উহাতে বিদ্যমান। কিন্তু সব উপাসনাকেই 'ওঁ' মন্ত্রে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। তোমরাও এক ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানে এবং 'ওঁ' মন্ত্রে সব প্রকারের উপাসনা করিতে পারিবে। তাহার পর ধীরে ধীরে মন যখন ক্রমশঃ উন্নত জ্ঞানভূমিতে উঠিতে থাকিবে তখন দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম সবই ঠিক ঠিক বুঝিতে জানিতে পারিবে। তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে শরীর তত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম জ্ঞান লাভই ব্রহ্মজ্ঞান এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম সবই মনস্তত্ত্বের স্তর মাত্র। উহার জ্ঞান ভিন্ন আমাদের তৃপ্তি হয় না এবং আমাদের সমাজধর্ম্ম, রাজ ধর্ম্ম, শিক্ষা বা কোন কার্য্যই মানুষের মঙ্গলের অনুকূল হইয়া পরিচালিত হইতে পারে না।

সিন্ধুর জল নদে ও খালে একই সিন্ধুর জল। এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও দেবতা একই ব্রহ্মের বিস্তার মাত্র। তোমরা যে কোন মন্দিরে যাইয়া ওঁ গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তোত্র দ্বারা এবং ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান করিয়া জল, ফুল, দীপাদি দান করিয়া পূজা করিতে পারিবে অথবা বিভিন্ন দেবতার নির্দ্দিষ্ট নাড়ীও ধ্যান করিতে পারিবে। তোমরা দেবতার উপাসনা বুঝিলে, এবার পিতৃ উপাসনার কথা শোন।

পিতৃ উপাসনা

মাতা পিতা; তাঁহাদের মাতাপিতা ক্রমে যদি আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী গণের উর্দ্ধ ধারার আলোচনা করি তবে দেখিতে পাইবে, আমাদের জন্ম কোন না কোন ঋষি হইতে আসিয়াছে। ঋষিগণ সকলেই প্রজাপতির মানস পুত্র। এই প্রজাপতি ব্যাপক ঈশ্বরের নিম্নতম স্তর। ইঁহাকে সমষ্টির মানস ভূমি বলা যায়। এই প্রজাপতির উচ্চতর স্তরের নাম হিরণ্যগর্ভ বা বিষ্ণু। এই হিরণ্যগর্ভকে সমষ্টির চিত্তভূমি বলা যায়। এই হিরণ্যগর্ভ হইতে উন্নততর স্তরের নাম রুদ্র বা শিবস্তর। এখানে সমস্ত জীবের অহংগুলি এবং পঞ্চমহাভূতের সূক্ষ্মতম কণাগুলি (পঞ্চতন্মাত্রা) অণু বা বিন্দুরূপে অবস্থান করে। এই শিব ভূমির উপরের স্তরের নাম শক্তিস্তর বা ব্রহ্মস্তর বা পুরুষোত্তম স্তর। হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া শক্তিস্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরেরই আবার স্তরভেদ আছে। তা যাহাই থাকুক, কিন্তু তোমরা এতটাই জানিয়া রাখ যে এই যে আমি ও তুমি এবং আমার ও তোমার শরীর এখানে আছে; ইহা এক অনাদি ব্রহ্মশক্তির অত্যন্ত স্থূল পরিণতি। আমি, তুমি ও আমাদের পিতামাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মশক্তি পর্য্যন্ত এই যে সৃষ্টির ক্রমধারা এই ক্রমধারার নাম পিতৃজগৎ। তর্পণে এবং শ্রাদ্ধে এই ধারারই উপাসনা হইয়া থাকে।

সিন্ধুর জল এবং সিন্ধুসংযুক্ত ঐ খালের জল একই জল। যাহারা খালের ধারে থাকে তাহারা নৌকায় চড়িয়া ধীরে ধীরে সিন্ধুতে যাইয়া পৌছিতে পারে। ঠিক এইরূপ সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মাগণ ব্রহ্ম জ্ঞানের স্তরে থাকেন। যাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা একটু কম জ্ঞানী তাঁহারা দৈবী সম্পদ বা দেবতা ভাবের ধারা ধরিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের কতকটা আভাস লাভ করেন। যাঁহাদের দৈব ভাব কম তাঁহারা শরীরের ধারা ধরিয়া অর্থাৎ পিতৃধারা ধরিয়া ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হন। পিতৃধারা যেন সিন্ধু-খালেরই প্রশাখা।

যাঁহারা রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ও বিজ্ঞান নীতির কেন্দ্র ধরিয়া অবস্থিত এবং এক একটী শক্তিশালী পুরুষ; তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের খণ্ড শক্তির ধারাতে অবস্থিত জানিবে। রাজনীতি = শক্তিস্তর। ধর্ম্মনীতি = শিবস্তর। সমাজনীতি = বিষ্ণুস্তর। শিক্ষানীতি = সূর্য্যস্তর। বিজ্ঞাননীতি = গণেশ। এইরূপ মানুষ খণ্ড ঈশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিশালী। ইঁহাদের নিম্নে দৈব ভূমির ধারা।

আমরা যে কোন ধারা ধরিয়াই ব্রহ্ম জ্ঞানের পথে চলি না কেন; সব ধারাতেই আমাদিগকে ঐ ব্রহ্ম নাড়ীকে কেন্দ্র করিতে হইবে। তবেই আমাদের উপাসনার লক্ষ্য যে ব্রহ্ম উহা সিদ্ধ হইবে।

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে মুসলমানেরা ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্ বা গডের উপাসনা করে উহা কি? উত্তর - উহাদের উপাসনার সঙ্গে কোনই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি নাই। উহারা উপাসনা করে ইহুদি কল্পিত একটি কল্পনার ধারাকে। কুরানের আল্লাহ্ এবং বাইবেলের গড একই বস্তু। কুরান এই বিষয়ে বাইবেলের নকল করিয়াছে। প্রজাপতি অর্থে সমষ্টিমন। কাজেই ইহারা সমষ্টিমনেরও উপাসক নহে। ইহারা কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহুদির কোন কল্পনা বিলাসের উপাসক। ইহা এত যুক্তিহীন কল্পনা যে ইহাতে দৈবী ভাবও স্থান পায় নাই। কুরানে একমাস রুজা রাখার আদেশ আছে। উহাতেও ব্রহ্মচর্য্যের বা সংযমের অংশ বাতিল। সেখানে অবাধ ভোগের আদেশ আছে। কাজেই শরীরশুদ্ধির বিজ্ঞানও বাতিল করা হইয়াছে। কোন প্রকার শুদ্ধি উহা দ্বারা অসম্ভব। কেহ কেহ গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং" প্রমাণ দ্বারা কল্পনা বিলাসকেও সমর্থন করেন। আমরা বলিতে পারি আর্য্য দার্শনিক ধারার সঙ্গে 'গড' বাবা বা আল্লাহ্ মিঞার কোনই মিল নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বর, দেবতা, মহাপুরুষ বা প্রেত কাহারও সঙ্গে গড্ বা আল্লাহ্র মিল নাই। গীতার ঐ উক্তি ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি দেখ। ভ্রান্ত ধারণার স্পর্দ্ধা থাকিবে না। উহাতে পিতৃ, দেবতা, ভূত ও ব্রহ্মোপাসনারই কথা আছে।

পিতৃধারার মধ্যে দিয়া যে ব্রহ্মোপাসনা, উহাতে শরীরের শুদ্ধতা বৃদ্ধি হয়। এজন্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে দীর্ঘ সময় ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিতে হয়। তোমরা মনে রাখিবে ব্যায়াম, স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিপালন ও ব্রহ্মচর্য্য ধারণ দ্বারা শরীরশুদ্ধি ব্রহ্ম জ্ঞানেরই একটা অঙ্গ। ইহাই পিতৃধারার ব্রহ্মোপাসনা। (শরীর শুদ্ধির জন্য ব্যায়াম বিষয়ক একটা অংশ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে)।

পিতৃধারায় শরীর শুদ্ধি, দৈবী ধারায় ভাবশুদ্ধি, শক্তি ধারায় সগুণ ব্রহ্মধারায় নীতি-শুদ্ধির পথে আমরা একই ব্রহ্ম শক্তির উপাসনায় ব্রতী। যাঁহারা সোজা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে ব্রতী তাঁহারা যোগাভ্যাস ও বিচার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন। আমাদের শাস্ত্রে পিতৃধারা, দৈবধারা, শক্তিধারা এবং আত্মশুদ্ধি, সব পথেরই অনুশীলন সকলকে করিতে হয়। তোমরা এ সব ধারা সম্বন্ধে যত আলোচনা করিবে ততই হিন্দু ধর্ম্মের বিজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। গড্ ও আল্লাহ্ মিঞার উপাসনার সঙ্গে শুদ্ধিবিজ্ঞানের কোনই সম্বন্ধ নাই। তোমরা কোরান ও বাইবেল পড়, সব বুঝিতে পারিবে।

প্রেত উপাসনা

প্রেত উপাসনা বুঝানো একটু জটিল হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রে যখন উহার বিধান আছে তখন এ সম্বন্ধেও বলিতে হইবে। প্রেত সম্বন্ধে অত্যধিক কিংবদন্তী সমাজে প্রচলিত, কাজেই প্রেতের আলোচনায় অনেকে ভীত হয়। বলা প্রয়োজন, ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

মানুষের মৃত্যুর পর শরীরটা থাকিয়া যায়। এবং শরীরের উপাদান নিজ নিজ পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আত্মাটার সেইরূপ হয় না। উহা অমরই থাকিয়া যায়। একটা মানুষকে তুমি এখন যেরূপ দেখিতেছ মৃত্যুর পর তাহার স্থিতি ঠিক সেইরূপই থাকে, কেবল বিশেষ এই যে 'শরীরটা আলাদা হইয়া যায়।' তাহার শরীরের আকার, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, বিবেক সেই আত্মাটীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকে। এইরূপ শরীর ত্যক্ত আত্মার যদি ভোগ, মোহ এবং কামাদির বিশেষ প্রবল আকর্ষণ থাকে তবে সে এই পৃথিবীর খুব নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। তাহারা যতক্ষণ তাহাদের শরীরহীন অবস্থার সহিত নিজেদের স্বভাবকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে না পারে ততক্ষণ প্রেত বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ স্থিতিতে আত্মারা বেশ কষ্ট পাইয়া থাকে। কাজেই মৃত্যুর পূর্ব্বেই সকলের কর্ত্তব্য যথেষ্ট জ্ঞানানুশীলন করা যাহাতে এরূপ অবস্থা ভোগ করিতে না হয়। এইরূপ অবস্থায় স্থিত প্রেতগণকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রেত বলিয়া জানিবে। ইহারা নিজেদের স্থিতিতে এত উদ্বিগ্ন যে কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট করার শক্তি ইহাদের থাকে না। কাজেই এসব প্রেত হইতে কোনই ভয়ের কারণ নাই। ব্রহ্ম-দৈত্য ও অপমৃত্যুদের অনেকে এইরূপ প্রেত হয়। ইহারাও নিম্নশ্রেণীর প্রেত। নিম্নস্তরের অশিক্ষিত লোকেরা এইরূপ প্রেতের খুব উপাসনা করে। প্রেত উপাসকদের মধ্যে ভণ্ডের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহারা মিথ্যা কথা বলিয়া অনেক লোকদের ভুলাইয়া ঝাড় ফুক করিয়া ভাল উপার্জ্জন করে। অনেক মুসলমানকেও এই সব ভণ্ডামীর ব্যবসা করিতে দেখা যায়। তোমরা এই সব ভণ্ডগণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা কঠোর থাকিবে। মহরম বাদী মুসলমানের মধ্যে এইরূপ অনেক ভণ্ড চিকিৎসক আছে। মহরম, কবর উপাসনা বা প্রেত উপাসনারই একটা অনুষ্ঠান। নিম্নস্তরের প্রেতের কথা বলা হইল এবার উন্নত স্তরের প্রেতদের কথা বলা হইবে। নিম্নস্তরের প্রেত উপাসনায় কোনই লাভ নাই।

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হইয়াছে। যথা - (১) প্রজাপতি স্তর বা সমষ্টি মন। (২) হিরণ্য গর্ভের স্তর বা সমষ্টি চিত্ত বা বিষ্ণু। (৩) তান্মাত্রিক স্তর (শিব স্তর), (৪) শক্তি স্তর। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রত্যেক স্তরের মধ্যেই অনেক শাখা স্তর আছে। এসব প্রত্যেক স্তরেই আত্মাগণ অবস্থান করে। আমাদের মন যত উন্নত স্তরে থাকে, আমাদের মনের ক্রিয়ার সঙ্গে তত উন্নত স্তরের আত্মাগুলির সংযোগ হয়। এই সব আত্মা আমাদের বিচার, বিবেক, ত্যাগ, যোগ, বীরত্ব, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আমাদের অলক্ষ্যিতে সাহায্য করেন। অনেক সময় অনেক বিষয়ের মীমাংসার সহায়ক হন।

একমাত্র দুর্গাপূজার মন্ত্রে উন্নত স্তরের ভূত পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গাপূজার এই অংশকে ভূতপূজা বলে। উন্নত স্তরের ভূত পূজার বেশীর ভাগ মন্ত্রই বেদ হইতে সংগৃহীত।

এমন অনেক মূর্ত্তিপূজক সাধক আছেন যাঁহারা খুব সজ্জন এবং ভক্তিমান, কিন্তু ব্যাপক ঈশ্বরের তত্ত্ব জানেন না। তাঁহাদের ধারণা ঐ মূর্ত্তিই ঈশ্বর। ইঁহাদের ভক্তির প্রভাবে অনেক সময় উন্নত স্তরের আত্মারা অভীষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শন দেন। অনেক ভক্তিমান সাধক ও মূর্ত্তিউপাসক মূর্ত্তিধ্যান করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করেন এবং সেইরূপ দেব বা দেবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেব মন্দিরে বা সেইরূপ স্তরে অবস্থান করেন। এইসব আত্মাগণও ভক্তগণকে দর্শন দেন। এইরূপ প্রেতদের শক্তি খুব বেশী নয়; কাজেই তোমরা সব সময় দার্শনিকতা, যুক্তিবদ্ধ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবে। অনেকে নিজের সমাধি বা কবরের নিকট প্রেত হইয়া অবস্থান করেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রভাব জাহির করিয়া ভক্তি পূজাদি আদায় করেন। অনেক সময় অনেক শক্তিশালী নেতার দ্বারা অপ্রত্যাশিত সাংঘাতিক ভুল হইয়া একটা জাতের সর্ব্বনাশ হইতে দেখা যায়। হিট্‌লারের জীবনে ঐরূপ ভুল হইয়াছিল। ইহা যে মনের উপর ভূত জগতের প্রভাব সন্দেহ নাই। কালী, কৃষ্ণ, গড ও আল্লার দর্শনকারী অনেকেই প্রেতদর্শক মাত্র।

তোমাদিগকে প্রচলিত সব রকম উপাসনার রহস্যই বলা হইল। তোমরা সব সময় ব্রহ্মোপাসনার বিকাশ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবে। (১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যের বিধান ও ব্যায়াম দ্বারা শরীর শুদ্ধ রাখিবে। (২) দৈবী সম্পদের অনুশীলন দ্বারা মনের তেজস্বিতা ও উদারতা বৃদ্ধি করিবে। (৩) সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া উন্নত নীতিজ্ঞান

সংসারে প্রতিষ্ঠা করিবে। এবং আসুরিকগণকে কঠোরভাবে দমন করিবার পথ করিবে। (৪) ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যানযোগে যোগানুশীলন দ্বারা আত্মাশুদ্ধি আয়ত্ত করিয়া আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অগ্রসর হইবে। (৫) উন্নত প্রেতজগৎ তোমাদিগকে আপনিই সাহায্য করিবে; সেজন্য কোন উপাসনার প্রয়োজন হয় না। দুর্গামূর্ত্তি, কালী, তারা আদি দশ মহাবিদ্যার মূর্ত্তি ও অন্যান্য বহু প্রাচীন মূর্ত্তিতে বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিবে। যথা বিধিতে শক্তিপূজা করিবে। তাহাতে উন্নত স্তরের ভূতগণ তোমাকে সাহায্য করিবেন। যে কোন মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজ বিপ্লবকালে মহাশক্তির পূজা করিয়া নেতাগণ নিশ্চয়ই শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবেন। মহাশক্তির পূজা বিধি এবং মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার।

শীতলা মূর্ত্তি

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে মহাবীর হনুমান এবং শিব ও নারায়ণের মূর্ত্তির কথা বলিয়াছি। আমাদের দেশে দুইরকম মূর্ত্তি আছে। (১) যন্ত্রমূর্ত্তি। (২) শিল্পমূর্ত্তি। শিবলিঙ্গ, নারায়ণ শিলা, পতাকা, এসব যন্ত্রমূর্ত্তি। তন্ত্রে অসংখ্য যন্ত্রমূর্ত্তির ব্যবস্থা আছে। তোমরা দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় যন্ত্র আঁকিবার বিধান দেখিলে সব বুঝিতে পারিবে। শিল্পমূর্ত্তিগুলিতে হাত, পা, চক্ষু, মুখ সব থাকে।

তোমরা শীতলা মূর্ত্তি দেখিয়াছ। বসন্তের প্রকোপ হইলে এই মূর্ত্তি গড়িয়া মহাশক্তির আরাধনা করা হইয়া থাকে। একটী গর্দ্দভ, একটী কুলা, একটী ঝাড়ু, একটী জলপূর্ণ কলসী ও একটি মহামান্যা শক্তিমূর্ত্তি উহাতে দেখিতে পাইবে।

গর্দ্দভ প্রাচীনকালে সহরের বা গ্রামের কুড়া ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এই জন্য অছুঁত পশু এবং ইহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে। ইহাদের অনেক গুণ আছে। এই জীব গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত শীতল থাকে। ইহাদের শরীরে গ্রীষ্মের তাপ লাগেনা। ইহাদের বসন্ত রোগও হয় না।

কুলা - পথের ময়লা ও আবর্জ্জনা উঠাইবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। আজকাল টীনের কুলা মিউনিসিপ্যালিটী ব্যবহার করে।

ঝাড়ু - বাড়ী, ঘর, রাস্তা, দেওয়াল পরিষ্কার করিবার বিখ্যাত অস্ত্র।

জলপূর্ণ কলসী - নর্দ্দমা ও পচা স্থান ধুইবার জন্য জল ও ঝাড়ুর প্রয়োগ কিভাবে করিতে হয় ইহা তোমরা জান।

শক্তিমূর্ত্তি - ইহার অর্থ নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগে বাড়ী, ঘর, রাস্তা, সহর ঐ সব অস্ত্র সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। ইহা দ্বারা বসন্ত নিবারণ হয়।

কি ভাবে এই শীতলা মূর্ত্তি আবিষ্কার হইয়াছিল ইহা আমরা জানি না। আমাদের মনে হয় কোন যুগে কোন শ্রেষ্ঠা মহিলা কোন সহরে বা গ্রামের মহামারী কালে এই সব যন্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা জনপদ পরিষ্কার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আদর্শ এতই কৃতকার্য্য হইয়াছিল যে তিনি যখন যে গ্রামে যাইতেন এবং পরিষ্কার করিতেন সেই গ্রামই রোগ মুক্ত হইত। পরবর্ত্তী যুগে লোকে তাঁহার আদর্শে বাড়ীঘর পরিষ্কার করিয়া এই মহীয়সী মহিলার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই মহাশক্তির পূজা করিয়াও ঐ ফলই পাইতে লাগিল। তোমরা মহাশক্তির আরাধনা কালেও গায়ত্রী, ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান ও ব্রহ্মস্তোত্রাদি পাঠ করিবে। কারণ ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তির আরাধনা। কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তিগুলিও ঠিক এইরূপ সমাজ সেবায় শ্রেষ্ঠ আদর্শ জ্ঞাপক মূর্ত্তি। সমাজ সেবা ও ঈশ্বরোপাসনা এক, সকল শক্তি উপাসনায় ও মূর্ত্তি বিজ্ঞানে এই কথাই প্রচার করা হইয়াছে। ধ্যান, জ্ঞান ও যোগের সঙ্গে সমাজ সেবার শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী আদর্শ তুমি অবলম্বন কর। ইহাই ঈশ্বর ভক্তি।

আমাদের দেশে গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, রাগ, রাগিনী, যোগাদিরও মূর্ত্তি আবিষ্কার করা হইয়াছে। তোমরা বাড়ীতে দশ মহাবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া এসব মূর্ত্তি রাখিবে এবং প্রত্যেকটীর রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

অস্ত্র প্রতীক (কৃপাণ)

শিব, নারায়ণ ও শীতলা মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এবার তোমাদিগকে অস্ত্রপ্রতীক সম্বন্ধে কিছু বলিব। ত্রিশূল, কৃপাণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অঙ্কুশ, নাগপাশ, যষ্ঠী, ঘণ্টা, বীণা প্রভৃতিকে অস্ত্র প্রতীক বলে। তোমরা দুর্গাপূজা দেখিলে দেখিতে পাইবে, অনেক অস্ত্র প্রতীকের পূজার বিধান আছে। এক একটী অস্ত্র এক একটী দেবতার স্বরূপ। যেমন কৃপাণ = মহাশক্তি দুর্গা = তেজ। ত্রিশূল = শিব (শান্তি বা জ্ঞান)। চক্র = বিষ্ণু (সংগঠন, প্রেম)। অঙ্কুশ = গণেশ (পশুত্বকে নিয়মে রাখা, সংযম)। দেবতা পূজা অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে দৈবী ভাব ও অসুর ভাবের আদর্শ লইয়া জগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করে। অস্ত্র প্রতীক বিশেষ বিশেষ দৈবীভাব মাত্র। বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরে এক এক প্রকারের দৈবীভাব অত্যন্ত প্রবল হয়। এজন্য এক একটি অস্ত্রকে এক এক প্রকার শক্তিরূপে মানা হইয়া থাকে। তোমরা প্রাচীন হিন্দু সমাজের ইতিহাস এবং মধ্যযুগের হিন্দুদের উত্থান পতনের সব ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কৃপাণকে সব স্থানেই বড় উচ্চ প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক রাজাদের গৃহে এই কৃপাণের পূজা হইত। এবং ঐ কৃপাণের অন্য নাম ছিল 'ভবানী'। এখনও আমাদের দেশে বহু উচ্চ প্রতিষ্ঠ বংশে কৃপাণের পূজা হইয়া থাকে। দেশের কর্ম্মিগণ ও তোমরা এই কৃপাণ প্রতীককে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে জাগাইয়া তুলিবে। কৃপাণের সামনে উপাসনা করিলে উপাসনা বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। কাজেই তোমরা উপাসনার সময় সুবিধা থাকিলে উহার সামনেই উপাসনা করিবে। ইহার দ্বারা তেজস্বিতা এবং সমাজ জীবনের একতা বৃদ্ধি হয়। তোমরা শিবাজীর 'ভবানীর' নাম শুনিয়াছ। কথিত আছে এই 'ভবানী' এত শক্তিশালী ছিল যে ইহার প্রভাবে শিবাজী সহজে যুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন। রামদাস স্বামী কৃপাণকে শিবাজীর প্রিয় করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ এই কৃপাণকে শিখ সমাজের রক্ষক করিয়াছিলেন। নেপালী ক্ষত্রিয়গণ এই কৃপাণের প্রসাদে আজও স্বাধীন জাতির সম্মানে সম্মানিত। কৃপাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ক্রমবিকাশ নামক গ্রন্থে দেখিবে। কৃপাণে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অবতার, মহাপুরুষ এবং যে কোন দেবতার পূজানুষ্ঠান করা যায়। প্রত্যেক মন্দিরে কৃপাণ প্রতীক রাখিবে। কৃপাণ উৎসব এবং কৃপাণ শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য বিজয়া দশমী (বাসন্তী ও শারদীয়া) প্রশস্ত দিন। আত্মবিকাশের পথে মানুষ যখন ঠিক আত্মজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁহার কার্য্য দ্বারা সমাজ রক্ষা এবং অসুর ও বর্ব্বরতা বিনাশের আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কৃপাণের কর্ম্মবিজ্ঞানে ইহাই আদর্শ। এই গণতন্ত্রের যুগে বহুকর্ম্মী সমাজের সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং বর্ব্বরতা ও আসুরিকতাকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার এইরূপ কৃপাণ আদর্শ গ্রহণ করিলেই সমাজের মঙ্গল হইবে। দুর্গাপূজায় বলিদান এই খড়্গেরই পূজা। পৌরোহিত্যবাদীরা বলিদানটাকে দক্ষিণা ও ঘুষ দানের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়া ইহার মহান আদর্শ খর্ব্ব করিয়াছে। নিজের মধ্যস্থিত মহাশক্তিকে রাজস ভাবে জাগাইয়া তোল। এই বিজ্ঞানে সমাজ গড়িয়া লও; ইহাই বলিদান, ইহাই কৃপাণ পূজা। ছাগ বলি উহার একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। ছাগ বলি না দিলেও উহা কেবল গায়ত্রী উপাসনা দ্বারা জাগানো যায়। ভাববাদীরা বলিদান সম্বন্ধে অনেক অবান্তর কথা প্রচার করিয়াছেন এবং নিজেদের অদূরদর্শিতা, মূর্খতা ও ভীরুতার চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন। পৌরোহিত্য বাদীরা এই বলিদান ব্যাপারে দক্ষিণা আদায় সুগম করিবার জন্য ঈশ্বরকে ঘুষ খোর প্রস্তুত করিয়াছে। তোমরা কৃপাণ পূজা দ্বারা, বীরত্ব ও একতা অর্জন করিও। মনে রাখিও যাহারা ভীরু, যাহারা নিস্তেজ, তাহারা হিন্দু ধর্ম্মের কোন প্রকারেই উপযুক্ত নহে। ইহারা মিথ্যুক এবং চালবাজীকেই নিজেদের অন্তরে ধর্ম্মের নামে স্থান দিয়াছে। যাঁহারা তেজস্বী, তাঁহারাই সত্যবাদী, ত্যাগী, যোগী, জ্ঞানী ও মহান হইতে পারেন। নারায়ণ শিলা, শিবমূর্ত্তি ও কৃপাণের মধ্যে

কৃপাণই তোমাদের জীবনকে বেশী বিকাশে সাহায্য করিবে। জানিয়া রাখিও, আত্মা অমর। আত্মার মৃত্যু নাই। এবং অসুর থাকিতে আত্মবিকাশ নাই। অসুর নাশের জন্য যে বীরত্ব ও সমাজ রক্ষায় আত্মদান উহাই ঠিক ঠিক অধ্যাত্মবাদের আদর্শ। জানিয়া রাখিও অসুর নাশে আত্মার নাশ হয় না – উহার দ্বারা সমাজ নিষ্কলঙ্ক হয় এবং মানুষের বিকাশের অনুকুল হয়। এজন্য কৃপাণ পূজা হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধান। কৃপাণপূজা বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ওঁ অসুরাসৃগ্ বসা পঙ্ক চর্চ্চিতস্তে করোজ্জলঃ।
শুভায় খড়্গ ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্।
চণ্ডী ১১॥ ২৮॥

হে চণ্ডিকে, দৈত্যদিগের রক্ত-বসা-পঙ্ক-চর্চ্চিত প্রভাশালী তোমার খড়্গ আমাদের মঙ্গল করুক। আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

ওঁ অসির্বিষসনঃ খড়্গে তীক্ষ্ণ ধারো দুরা সদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্ম পালো নমোঽস্তুতে॥
দুর্গাপূজা বিধি॥ অস্ত্র পূজা ২॥

যে খড়্গ সর্পের বিষের মত জ্বালাকারী, যাহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার, যাহা অপরাজেয়, যাহা ঐশ্বর্য্যের আধার, যাহা বিজয়ের প্রতীক, হে ধর্ম্ম রক্ষক (খড়্গ), তোমাকে প্রণাম।

কৃপাণকে অসুর, গুণ্ডা, আসুরিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ ঠীক ঠীক কৃপাণ পূজা। উহা না করিয়া পুষ্প চন্দনে পূজা মানে পৌত্তলিকতা মাত্র।

উপাসনায় অগ্নি, জল ও ব্রহ্মনাড়ী

তোমরা যখন পূজাপদ্ধতি পড়িবে, দেখিতে পাইবে - সব পূজাতেই যজ্ঞের বিধান আছে। সব পূজাতেই জলের যথেষ্ট প্রয়োগ বিধান আছে। অগ্নি, জল ও ধ্যানাদিসহ মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগই পূজায় আসল অবলম্বন। অন্যান্য বস্তু ও উপাদান এবং উপচার ও নৈবেদ্যাদি গৌণ অবলম্বন, উহা না হইলেও উপাসনা চলে।

অগ্নি - 'তেজ' নামক দৈবী সম্পদই অগ্নি। শরীরের মধ্যে মূলাধারে ইহার কেন্দ্র বিদ্যমান। তেজ বৃদ্ধির জন্য অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার বিধান জানিবে। তোমরা যখন বেদ পড়িবে তখন দেখিতে পাইবে সমস্ত প্রকার দেবতার স্তুতি ও আহুতি মন্ত্রে অসুর নাশের ও নিজের শক্তি বৃদ্ধির (ধন, জন, অস্ত্র, সংগঠন) কথা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইহা আমাদের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় দিক। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও উচ্চ সামাজিক জীবনের আদর্শ হীন হইবার দরুণই অগ্নিহোত্রী পৌরোহিত্যবাদী ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই নিস্তেজ হইয়া থাকেন।

জল - যখনই বিস্তারিত সন্ধ্যা করিবে তখন দেখিতে পাইবে ইহাতে কেবলই জলের প্রয়োগ। সন্ধ্যা করিবার পরই দেখিতে পাইবে কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে তোমার মন শান্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তিষ্কের শিবকেন্দ্রে সোমচক্র বিদ্যমান। জলপ্রয়োগসহ উপাসনা দ্বারা মন উহার সংযোগ লাভ করে।

ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান - উপাসনায় অগ্নিই থাকুক বা জলই থাকুক, ধ্যান উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। যদি তোমরা উন্নত স্তরের যোগীদের সংস্পর্শে থাক তবে দেখিতে পাইবে তাঁহারা কিরূপ তেজস্বী ও শান্ত। তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্রহ্মধ্যানে থাকিয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। জীবনের এক সময় অগ্নি ও জলের যথেষ্ট প্রয়োগ দ্বারা তেজ ও শান্তি আয়ত্ত করিতে হয়। পরে ধীরে ধীরে কেবলই ব্রহ্মধ্যানে তাঁহারা সবটাই পাইয়া

থাকেন। ইহাদিগকে যদি কখনও যজ্ঞ বা সন্ধ্যা বা উপাসনা করিতে দেখিতে পাও, দেখিবে, দিব্য তেজ ছটায় বা শান্তির ধারায় ইহাদের মুখ চক্ষু ভরিয়া গিয়াছে। 'অগ্নি' কর্ম্মকাণ্ডের কেন্দ্র। 'জল' উপাসনা কাণ্ডের কেন্দ্র। 'ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান' জ্ঞানকাণ্ডের কেন্দ্র। উপাসনায় এই তিনটী বস্তু আমাদিগকে তিন দিকে পুষ্ট করিয়া দেয়, যাহার ফলে জ্ঞান আমাদের সহজে লাভ হয়।

এবার তোমাদিগকে জ্ঞান সম্বন্ধে বলিব।

জ্ঞান ধর্ম্ম

তোমাদের পক্ষে জ্ঞানধর্ম্ম বুঝা একটু কঠিন হইবে। এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুধর্ম্মে জ্ঞানধর্ম্ম বা দার্শনিকতা বিদ্যমান। অন্য কোন ধর্ম্মেই দার্শনিকতা নাই। অন্য ধর্ম্মে 'কি' এবং 'কেন' প্রশ্ন করিলে বিশ্বাসবাদীরা তোমাকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া আক্রমণ করিতে আসিবে। কারণ উহার জবাব দিলে ঐ সব ধর্ম্মের ভিত্তিই থাকিবে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই কথা খাটে না। তুমি যত প্রশ্ন কর সব প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত মীমাংসা এবং যুক্তিযুক্ত উত্তর হিন্দুধর্ম্মে বিদ্যমান। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মানুষ মাত্রেই নিজের ধর্ম্মে একটা জন্মগত মোহ থাকে। ধর্ম্মে প্রবল শ্রদ্ধা থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মোহ থাকা কর্ত্তব্য নহে। যদি আমরা সর্ব্বদা জ্ঞানধর্ম্ম ও দার্শনিকতার আলোচনা না করি তবে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান মূর্খ ও বর্ব্বর বা পশুদের সমতুল্য হইয়া যাইবে। কাজেই তোমরা নিজেদের এবং প্রত্যেক অহিন্দু ধর্ম্মেরই দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদ আলোচনা করিয়া চলিবে। জ্ঞানধর্ম্মে বিশ্বাসবাদিতা বা ভণ্ডামীর স্থান নাই।

এই সৃষ্টি কি এবং কেন? আমি তুমি কি এবং কেন? বালক বৃদ্ধ কি এবং কেন? এই পৃথিবী, গ্রহ নক্ষত্র কি এবং কেন? কেহ পায় বেড়ায়, কেহ উড়ে, কেহ দুই পায়ে হাঁটে; কেহ একেবারে দাঁড়াইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। এসব কি এবং কেন ইত্যাদি প্রশ্নে মানুষের মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া উঠে। মানুষের কর্ম্ম, মানুষের উপাসনা ও মানুষের সমস্ত রীতি নীতির মূলে 'কি এবং কেন' প্রশ্ন জড়িত। ঈশ্বর, জীব, আত্মা, প্রকৃতি সমস্ত বিষয়ে মানুষ যুক্তিযুক্ত জবাব আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর কোন ধর্ম্মেই ইহার জবাব নাই। সর্ব্বরকমের 'কি' এবং 'কেন' কে মিটাইবার জন্য আমাদের মন ব্যস্ত। মন যাহা দ্বারা এ সব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে উপাদান পাইবে সেই উপাদানটির নাম 'জ্ঞান'।

মানুষের 'জ্ঞান' মিটাইবার জন্য তিনটী উপায় হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে - (১) অনুভূতি, (২) যুক্তি, (৩) বেদ বা ঋষিবাক্য।

'অনুভূতি' বুঝিতে হইলে সমস্ত যোগশাস্ত্র মন্থন করিতে হইবে। এবং যোগাভ্যাস করিতে হইবে। 'যুক্তি জ্ঞান' অর্জ্জন করিতে হইলে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে হইবে। এবং 'ঋষি বাক্য' বুঝিতে হইলে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে। তবে যোগাভ্যাস ও সাধনার অবলম্বন থাকিলে গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ (কয়েক খানা) ও রুদ্রী (সংহিতার সামান্য অংশ) পাঠ করিলেই চলে। সে সঙ্গে যোগদর্শনখানা আলোচনা করিলে ভাল হয়।

যতই শাস্ত্র পড় না কেন 'অনুভূতি' হীন জ্ঞান মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। কাজেই সব জ্ঞানের মূলে 'অনুভূতি জ্ঞান'। এজন্য প্রথমে সেই সম্বন্ধে সামান্য আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

গ্রন্থিভেদ জ্ঞান

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে ব্রহ্মনাড়ী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মনাড়ীস্থিত মর্ম্মস্থানগুলির নাম ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং ইত্যাদি। প্রত্যেক মর্ম্মস্থানে কিরূপ মনোবিজ্ঞান অবস্থান করে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে আছে (ক্রম বিকাশ অষ্টম অধ্যায় দেখ)। ব্রহ্মনাড়ীতে আমাদের আত্মা থাকিলেও আত্মা আমাদিগকে সোজা পরিচালিত করেন না। যদি আত্মা (ব্রহ্মনাড়ী) আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন তবে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারা শ্রীকৃষ্ণের মত বা গীতাজ্ঞানের মত হইত। আসল কথা, ব্রহ্ম নাড়ী ঐ সব মর্ম্ম গ্রন্থিদ্বারা আবরিত থাকে এবং আমরা এক এক জন এক এক প্রকার মর্ম্মগ্রন্থি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকি। কুবাসনা, কুমোহ, কুধর্ম্ম, কুচেষ্টা; আবার উচ্চ লক্ষ্য, অধ্যাত্ম প্রেম, যুক্তিবাদ, সুধর্ম্ম, সুবুদ্ধি, বিকাশচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবাপন্ন মানুষ দেখিতে পাই।

ব্রহ্ম গ্রন্থি। ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা, ও ভোগের কল্পনায় আমাদের মন ভরপুর থাকে। তোমরা দেখিতে পাইবে, আমরা কত আশা কত কল্পনা করি; তাহার একটীও ফলে নাই; তবু কল্পনা করিয়া হয়রাণ হই; কল্পনা ত্যাগ করিতেও পারি না। ইহার কারণ কি জান? ইহার কারণ মনের এক স্বাভাবিক গ্রন্থি আছে। মন ঐ গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকিবার দরুণ ঐরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। ঐ গ্রন্থির নাম ব্রহ্ম গ্রন্থি। নাভিচক্রে এই গ্রন্থি বিদ্যমান। যোগের ক্রিয়া এবং যোগীর সাহায্য ভিন্ন এইরূপ বৃথা কল্পনার গ্রন্থিভেদ করা কঠিন। এই গ্রন্থিভেদ হইলে মনের যোগশক্তি অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক ব্যাপকত্ব অনেকটা আয়ত্ত হয় এবং মনের স্বাভাবিক আরাম বৃদ্ধি হয়। এই গ্রন্থিভেদের পর আমরা কতগুলি বিষয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হইতে শক্তি পাই। ভবিষ্যতের বৃথা কল্পনা এই মর্ম্মভেদ হইলে শেষ হয়। ইহাকে মণিপুর গ্রন্থি বলে।

বিষ্ণু গ্রন্থি। ব্রহ্মগ্রন্থির রহস্যভেদ হইবার পর কিছু দিন পর্য্যন্ত মন বেশ আরামে থাকে। যদি মোহের সম্বন্ধ কোথাও না থাকে বা ঐরূপ সম্বন্ধ আমরা স্থাপন না করি তবে মনের আরাম যাইবে না। কিন্তু দেখা যায় কোন অজ্ঞাত শক্তির ইসারায় স্নেহ, ভালবাসা বা প্রেমের প্রেরণায় মন কোথাও বদ্ধ হইয়াছে এবং মন তাহার স্বাভাবিক যোগশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। দেখা যাইবে, মনকে কিছুতেই আয়ত্তে রাখা যাইতেছে না। যুক্তি, উপায়, বিবেক, বিচার, সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং অন্তঃকরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যোগের অনুশীলন দ্বারা এবং শক্তিশালী যোগী গুরুর সহায়তায় মনের এই গ্রন্থিও ভেদ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হইবার পর মন যতটা ব্যাপক ও নির্ম্মল হইয়াছিল এই গ্রন্থিভেদ হইবার পর মনের ব্যাপকত্ব ও নির্ম্মলত্ব আরও বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ মনের আরামময় স্থিতি আরও বৃদ্ধি হইবে। ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে 'অনাহত' কেন্দ্রে এই গ্রন্থি অবস্থিত। ইহা 'মহঃ' লোকের গ্রন্থি। ব্রহ্ম গ্রন্থিভেদের পর কিছু দিন মনের স্থিতি এত নির্ম্মল থাকে যে মনে হয় ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু গ্রন্থিভেদের পরও মনে হইবে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছু দিন বাদ বুঝা যাইবে এখনও অজ্ঞান গ্রন্থি আছে। ইতিপূর্ব্বে 'নারায়ণ শিলা' আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষ্ণু গ্রন্থির কথাই বলা হইয়াছিল। ইহাই হিরণ্যগর্ভ গ্রন্থি। ইহাই হৃদয় গ্রন্থি।

রুদ্র গ্রন্থি। বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদের পর সাধকের মনোবিজ্ঞানের অনেক রহস্য আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রথমটায় সাধক মনে করে এবার ঠিক ঠিক জ্ঞান ও শক্তি আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুদিন বাদে দেখা যায় এমন অনেক বিক্ষেপ আছে যাহাদের উপর অধিকার মোটেই সাধকদের হয় নাই। তখন কারণ খুঁজিলে দেখা যাইবে 'অহং' গ্রন্থি মাঝ খানে থাকিয়া 'মোহের' বীজকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এবং মনের ব্যাপকত্ব বাধা পাইতেছে। চেষ্টাদ্বারা 'অহং গ্রন্থি' ভেদ হইলে সমস্ত প্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্ব্বলতা হইতে আমাদের মন মুক্ত হয়। এবার আমাদের মন তত্ত্বজ্ঞানের ঠিক ঠিক উপযুক্ত হইল। এবার মন সব রকমের 'কি' এবং 'কেন'

প্রশ্নের ঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ সব মর্ম্মগ্রন্থি ভেদ হইয়া যাইবার পর অনুশীলন দ্বারা সব জ্ঞানই আয়ত্ত করা যায়। সাধুচরিত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে অনেক মহাপুরুষেরই ব্যবহারে বর্ণ বিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট বিদ্যমান। ইহাতে তোমরা বিস্মিত হইবে না। কারণ রুদ্র গ্রন্থি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন মহাপুরুষ খুব কম আছেন। মস্তিষ্কস্থিত অহং কেন্দ্রকে ভিত্তি করিয়া রুদ্র গ্রন্থি অবস্থিত (মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্রে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রে 'অহং' অবস্থান করে)। ইহা তপঃ লোকের গ্রন্থি। এই গ্রন্থিভেদে আমাদের ঠিক ঠিক 'সত্য' জ্ঞান লাভ হয়। মস্তিষ্কের শিবপিণ্ড ধ্যান দ্বারা এই গ্রন্থি ভেদের শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। ইহার নাম আজ্ঞাচক্র গ্রন্থি।

মর্ম্ম রহস্য জ্ঞান এবং মর্ম্মভেদ জ্ঞান দুইই "অধ্যাত্ম জ্ঞান" জানিবে। এইরূপ দুই প্রকার জ্ঞান না থাকিলে জীবন সুন্দর ও পূর্ণ হয় না। আমাদের জীবন একাধারে এইরূপ দুইটী জীবনের সমষ্টি। মর্ম্মকেন্দ্র আমাদের জীবনকে কিরূপে পরিচালিত করিতে চায় এবং ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মা আমাদের জীবনকে কিরূপে পরিচালিত করিতে চায় এবং ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মা আমাদের জীবনকে যেমনভাবে পরিচালিত করে এই দুইএর রহস্য যে জানে সেই জ্ঞানী। এই সম্বন্ধে বেদ, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা আছে। আমরা গীতা হইতে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। গীতায় এই সব মর্ম্মকেন্দ্র সংযুক্ত শরীরটীকে ক্ষেত্র বলিয়াছেন এবং ঐ ব্রহ্মনাড়ীই ক্ষেত্রজ্ঞ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ **১৩-১**

হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে। যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ **১৩-২**

হে ভারত, আমাকে (ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মাকে) সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান উহারই নাম জ্ঞান।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু॥ **১৩-৩**

সেই ক্ষেত্র কিরূপ, উহার বিকার কিরূপ, সেই বিকারে সংযম কিরূপ, উহার প্রভাব কিরূপ সংক্ষেপে উহা শোন।

ঋষিভি র্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ **১৩-৪**

ঋষিগণ সেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে বেদ মন্ত্রে গাহিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র পদে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥ **১৩-৫**

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রকারের বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ)।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ **১৩-৬**

ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (জ্ঞান), ধৃতি সংক্ষেপে (পূর্ব্ব শ্লোকের বিষয় সহ) ইহাই ক্ষেত্র।

(এই দুইটী শ্লোকের টিপ্পনী লিখিলে এক খানা বড় বই হইয়া যাইবে। তোমরা এসব ক্ষেত্র লক্ষণের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে জানিয়া রাখ। পঞ্চ মহাভূত - ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ক্ষিতিকেন্দ্র মূলাধারে,

অপকেন্দ্র স্বাধিষ্টানে, তেজকেন্দ্র মণিপুরে, মরুৎকেন্দ্র অনাহতে, ব্যোমকেন্দ্র বিশুদ্ধাখ্যে। অহংকেন্দ্র মস্তিষ্কে (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪ কেন্দ্রে)। বুদ্ধিকেন্দ্র আজ্ঞাকেন্দ্রে (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৭ কেন্দ্র)। দশ ইন্দ্রিয়ের সবগুলি কেন্দ্রই শিবপিণ্ডে। বাহিরের জগৎস্থিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দজ্ঞান বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রথম মস্তিষ্কের বিজ্ঞানময় কোষে যায়। মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্রে মনোময় কোষের ক্ষেত্র তোমাদের পক্ষে বুঝিতে কঠিন হইবে (ক্রমবিকাশ দেখ)। ইচ্ছার প্রধান ক্ষেত্র মণিপুরে। দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ হৃদয়ে। সজ্ঘাত প্রাণ কেন্দ্রে হয় (মস্তিষ্ক চিত্রে ৯ কেন্দ্র)। চেতনা = জ্ঞান (মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্রে ৫ কেন্দ্র)। ধৃতি বুদ্ধি কেন্দ্র (মস্তিষ্ক চিত্রে ৭ কেন্দ্র) এবং শান্তিকেন্দ্র (মস্তিষ্ক চিত্রে ৪ কেন্দ্র) মিশ্রিত শক্তিতে আসিয়া থাকে।)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃত্স্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ১৩-৩৩॥

হে ভারত, যেরূপ এক সূর্য্য সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করেন, ঠিক সেই রূপ এক ক্ষেত্রী (আত্মা) ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্য্যান্তি তে পরম্॥ ১৩-৩৪॥

যাঁহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিতে পারেন এবং যাঁহারা পঞ্চ ভূতের প্রকৃতি ও ইহা হইতে মুক্তির বিজ্ঞান জানেন, তাঁহারা পরম আত্মাকে জানিতে পারেন।

গ্রন্থিজ্ঞান এবং গ্রন্থিভেদ বিজ্ঞানই ক্ষেত্রজ্ঞান। আত্মা এই শরীরে কিরূপ নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত উহা যদি তোমরা জানিতে পার তবে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' জ্ঞানও লাভ হইল। গ্রন্থি ও গ্রন্থিভেদ জ্ঞান দুইটি কথার জ্ঞান নহে। ইহা ২+২=৪ এর মত অঙ্ক কষা জ্ঞান। ইহাই জ্ঞানের আসল কথা।

দার্শনিক জ্ঞান

বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, দৈবীমীমাংসা, কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্র; এই সাত খানা আমাদের প্রধান দর্শন শাস্ত্র। (ইহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি দর্শন শাস্ত্র আছে)। ইহার মধ্যে দৈবী মীমাংসা দর্শন খানা পাওয়া যায় না। ইহার অনুকূলে নারদীয়ভক্তি সূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র সামান্য অংশ পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের ভক্তিবাদ ব্যাখ্যা অনেক আচার্য্য করিয়াছেন। কাজেই দৈবী মীমাংসার অভাব পূর্ণ হইয়াছে। কর্ম্মমীমাংসা দর্শন খানা যাগযজ্ঞাদির বিধান ও মীমাংসা দর্শন। বৌদ্ধগণ এই দর্শন খানার বিরোধী ছিলেন। ব্রহ্মণ্যবাদের ভিত্তি স্বরূপ এই দর্শনখানাই পৌরোহিত্যবাদের ভিত্তি হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ খুবই কঠিন মনে হয়। জ্ঞানের অনেক ভূমি আছে বলিয়াই দর্শন শাস্ত্রও অনেকগুলি রহিয়াছে; এইজন্য উপাসনা কাণ্ডে সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্রের মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে দার্শনিক জ্ঞানের সব কথাই জানা গেল, বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হইয়াছে উহার সবগুলি কথাই এই তিন দর্শনের সার। সাংখ্য মতে সৃষ্টি নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির সমষ্টি।

(১) পুরুষ (জ্ঞ)। ইহাই পঞ্চ সগুণ ব্রহ্ম বর্ণিত শক্তি।

(২) অব্যক্ত (প্রকৃতি)।

(৩) মহৎ (ব্যক্ত)।

(৪) অহং তত্ত্ব। সগুণ ব্রহ্মের ইহাই 'শিব স্তর'।

(৫) পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)।

(৬) মন (মনোময় কোষই মন। ইহার অন্তর্গত মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অভিমান এইরূপ চারিটি ভাগ আছে)।

(৭) পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)।

(৮) দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, গুদা)।

সবগুলি মিলাইয়া ২৫ হইল। ইহাদেরই অন্য নাম ২৪ তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে মাত্র পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং আর সবই ক্ষেত্র। ইহাদের লক্ষণ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইল না। তোমরা জানিয়া রাখিবে এই তত্ত্বগুলির অনুভূতি সবই পূর্ব্বোক্ত সগুণ ব্রহ্মানুভূতির মত ব্যাপক।

পতঞ্জলি এই সব তত্ত্বের উপর আরও একটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উহার নাম 'ঈশ্বর'। এই ঈশ্বর বলিতে এই ২৪ টি তত্ত্বের সমষ্টিভূত এক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে।

বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্য মতে এই 'ঈশ্বর' সগুণ ব্রহ্ম বা সক্রিয় ব্রহ্ম। ইহার অন্য নাম "মায়া উপহিত চৈতন্য"। এই মতে এই ঈশ্বর এবং এই ২৪ তত্ত্ব সবই মায়া এবং ইহাদের অস্তিত্ব নাই। এই মতে এক নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মতত্ত্ব মাত্রই আছেন। সত্যই, ব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব মানিলে অন্য কোন তত্ত্বই আর মানা যায় না। অর্থাৎ ঠিক ঠিক ব্যাপক একটি তত্ত্বই হইতে পারে। আমরা উপাসনা কাণ্ডে এজন্য সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম দুই রকম উপাস্য তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছি।

কিছু দিন বার বার আলোচনা করিলে তোমাদের এই জ্ঞান অংশ আয়ত্ত হইয়া আসিবে। তোমারা নিজেদের এই ধর্ম্মজ্ঞানকে কঠিন মনে করিও না। তোমাদিগকে সৃষ্টির স্তরগুলি ভাগ করিয়া খুব সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইবে। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান অংশ দেখ।

মহামন্ত্র জ্ঞান

বেদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মাবিষয়ক বহু মহামন্ত্র আছে। এই মহামন্ত্রগুলির উচ্চারণ দ্বারা শান্তি ও জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। মহামন্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই মানুষ ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, সন্ন্যাস ও যোগীজীবন যাপন করেন। কয়েকটি মাত্র মহামন্ত্রের কথা বলা যাইতেছে। তোমরা উপনিষদ উক্ত মন্ত্রগুলি ও মহামন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া লইবে। নিত্য উপাসনার শেষে মহামন্ত্রও গাইবে।

১। ওঁ তত্ত্বমসি (সাম)। তুমি সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব।

২। ওঁ প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম। বা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥ (ঋক্) প্রজ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্ম।

৩। ওঁ অহং ব্রহ্মাস্মি॥ (যজুঃ) আমিই ব্রহ্ম।

৪। ওঁ অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ (অথর্ব্ব) এই আত্মাই ব্রহ্ম।

৫। ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। এই মহামন্ত্রটী তোমরা জাতীয় ধ্বনিরূপে প্রত্যেক উৎসবের উদ্দীপনার জন্য উচ্চারণ করিবে।

৬। ওঁ সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥

৭। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম॥

৮। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অমৃতং ব্রহ্ম॥

৯। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অভয়ং ব্রহ্ম॥

১০। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

১১। ওঁ হরিঃ ওঁ। (উপাসনার পর সুবিধা থাকিলে মহামন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবে)।

সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান

সৃষ্টির মোটামুটী ৪টা স্তর, যথা -

১। সৃষ্টির শক্তিস্তর।

২। সৃষ্টির বিজ্ঞানস্তর।

৩। সৃষ্টির দৈবস্তর।

৪। সৃষ্টির স্থূলস্তর।

প্রথম সৃষ্টির শক্তিস্তর সম্বন্ধে বলা যাক। এই স্তরের অন্তর্গত তিনটী স্তর আছে।

(ক) নির্গুণ ব্রহ্মস্তর।

(খ) সগুণ ব্রহ্ম। বা মায়া উপহিত চৈতন্য। বা ঈশ্বর। এই স্তরের কতগুলি শক্তিক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকিয়া সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

(গ) অব্যক্ত। অব্যক্ত কিরূপ তত্ত্ব উহা বুঝিতে তোমাদের অসুবিধা হইবে। এতটা জানিয়া রাখ - এক জ্যোতিহীন আবরণ। যাহার এক পারে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম এবং অন্য দিকে সৃষ্টিচক্র বিদ্যমান। এই সৃষ্টির আধারও এই অব্যক্ত।

সৃষ্টির বিজ্ঞান স্তরে মহৎ, পঞ্চতন্মাত্র ও আমাদের অহং তত্ত্বগুলি অবস্থান করে। এই স্তরের অন্তর্গত মোটামুটি দুইটী স্তর টানা যায়। (১) মহৎ জগৎ। (২) তন্মাত্র জগৎ।

১। মহৎ বা জ্ঞানময় বা ধ্বনিময় বা শব্দব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মস্তরের কয়েকটি শক্তির মিশ্রণে এই জ্ঞানময় জগৎ সৃষ্ট হয়। এই মহতের আশ্রয়ে পঞ্চতন্মাত্র ও আমাদের সমস্ত জীবের অহংবীজ সৃষ্ট হয়। পঞ্চতন্মাত্রকণা ও জীববীজকণা এখানে সৃষ্ট মাত্র হয় কিন্তু সেইগুলি এখানে অবস্থান করে না।

২। তন্মাত্র জগৎ। এই জগতে আমাদের এবং সৃষ্টির সমস্ত জীবের 'অহং'গুলি বীজ রূপে থাকে। এবং আমাদের শরীর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য যে ক্ষিতি আদি ভূতকণার (তন্মাত্র) প্রয়োজন হয় সেইগুলিও থাকে। ইহা শান্তি জগৎ। ইহা সমষ্টির অহং এর স্তর।

সৃষ্টির দৈব স্তর। ইহাই সৃষ্টির হিরণ্যগর্ভ। এখানে জীবের বীজগুলি সুখময় রূপ লাভ করে। একটি বীজে ও একটি অঙ্কুরে যতটা ভেদ, বীজ জগতের জীববীজের সহিত এই সুখময় জীবের ঠিক ঠিক ততটা ভেদ। এই দৈব সৃষ্টির অন্তর্গত আরও একটি স্তর আছে। উহার নাম প্রজাপতির স্তর। ইহাকে আমাদের সমষ্টির মন বলা যায়। হিরণ্যগর্ভ আমাদের সমষ্টির চিত্ত বা সমষ্টির সুখের স্তর। সগুণ ব্রহ্ম অংশে বর্ণিত গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, সবই এই স্তরের অন্তর্গত।

সৃষ্টির স্থূল স্তর। ইহাকে সৃষ্টির বিশ্বরূপও বলা যায়। এই পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র এবং আমাদের শরীরের একেবারে স্থূল অংশ এই জগতের অন্তর্গত। আজকাল সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা চলিয়াছে।

স্থূল সৃষ্টির স্তরে আমাদের শরীরটি আছে। দৈব সৃষ্টির স্তরে আমাদের মন, ভালবাসা বা কল্পনা ও স্বপ্ন এবং নিদ্রা জগৎ অবস্থিত। সৃষ্টির বিজ্ঞান স্তরের খুব কাছাকাছি আমরা সুষুপ্তি কালে অবস্থান করি। কিন্তু সৃষ্টির বিজ্ঞান ও জ্ঞানের স্তরে সমাধি ভিন্ন যাওয়া যায় না। সৃষ্টির শক্তিস্তরে আমাদের আত্মা অবস্থান করেন। এই স্তরে আমাদের সকলের আত্মা একই আত্মা রূপে স্থিত।

স্থূল সৃষ্টির স্তরকে বিশ্ব বলে, দৈব সৃষ্টির স্তরকে "তৈজস" বলে। বিজ্ঞান সৃষ্টির স্তরকে 'প্রাজ্ঞ' বলে। সৃষ্টির শক্তি স্তরকে 'তুরীয়া' বলে। এই 'তুরীয়ার' নিষ্ক্রিয় অবস্থার নাম ব্রহ্ম। ইতিপূর্ব্বে তর্পণে ব্রহ্ম (শক্তিস্তর), রুদ্র (বিজ্ঞান), বিষ্ণু (হিরণ্য গর্ভ) , প্রজাপতি (সমষ্টি মন বা ব্রহ্মা) প্রভৃতি তর্পণের কথা তোমরা নিশ্চয়ই ভুল নাই। সৃষ্টির এসব বিভিন্ন স্তর।

উপনিষদের জ্ঞান

১। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশ ৫॥

তিনি চল এবং তিনি অচল, তিনি দূরে তিনি নিকটে। তিনি সব বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত। চল = ক্রিয়াশীল অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম। অচল = নিষ্কল ব্রহ্ম। তিনি দূরে = আমরা যতক্ষণ জ্ঞানহীন আমরা ততক্ষণ দূরে। আমরা জ্ঞানী হইলে তিনি নিকটে হন।

২। যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যৈবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ঈশ ৬॥

যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

৩। স পর্য্যাগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরꣳশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু র্যাথাতথ্যতো ঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥
ঈশ ৮॥

তিনি অশরীর (শরীর লক্ষণ হীন), তিনি নির্ম্মল, তিনি অপাপ বিদ্ধ, জ্ঞানময়, প্রভু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার নিয়মে প্রজাপতিগণ (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মগণ) নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

৪। তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম যোগাধিগামেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। কঠ ৪১॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, গুহ্য, সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধি রূপ গুহায় অবস্থিত; গহ্বরে (সুষুম্না গহ্বরে) অধিষ্ঠিত, তিনি সনাতন, অধ্যাত্ম যোগদ্বারা (সমাধি দ্বারা) ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে অবগত হইয়া হর্ষ ও শোক অতিক্রম করেন।

৫। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,
তপাꣳসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদꣳসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ কঠ ৪৪॥

সমস্ত বেদ যে তত্ত্বকে একমাত্র লক্ষ্য বা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমস্ত প্রকার তপস্যা যাহার জন্য হইয়া থাকে, যাহাকে পাওয়ার জন্য সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করেন, আমি সংক্ষেপে বলিতেছি 'ওঁ' ই সেই পদ।

৬। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ কঠ ৪৫॥

এই অক্ষরই ব্রহ্ম স্বরূপ, এই অক্ষরই পরমতত্ত্ব, এই অক্ষরকে জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

৭। এতদাবলম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদাবলম্বনং পরম্ ।
এতদাবলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ ৪৬॥

এই ওঁকারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এই ওঁকারই পরম অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মতুল্য) পূজ্য হয়।

৮। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ব বস্থিতম্।
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ কঠ ৫১॥

তিনি শরীরেই আছেন, কিন্তু তাঁহার শরীর নাই। তিনি মহৎ এবং ব্যাপক। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া দুঃখ অতিক্রম করেন।

৯। অশব্দমস্পর্শম রূপম ব্যয়ং
অথারসং নিত্যমগন্ধতচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ কঠ ৬৯॥

তিনি (যিনি) অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, তিনি নিত্য, তিনি আদি অন্তহীন, তিনি মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সত্য, তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

১০। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। কঠ ৯৫॥

এক অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটী রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত একই আত্মা নানারূপ হইয়া রহিয়াছেন এবং বাহিরেও (অর্থাৎ আকাশে বাতাসে) ব্যাপ্ত আছেন। (আকাশস্থ) বাতাস, জল, বায়ু, বরফ আদি সমস্ত পদার্থেই কিছু না কিছু তাপ আছে। এই তাপই অগ্নি। এই তাপের স্থিতি কিরূপে আমাদের ভিতরে এবং সর্ব্বভূতের ভিতরে এবং আকাশে ব্যাপ্ত ইহা বুঝিতে পারিলে আত্মারও ব্যাপকত্ব বুঝা যায়। আত্মার ব্যাপকত্ব বুঝিবার জন্য ইহা অত্যন্ত সুন্দর উপমা।

১১। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেনানুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখাং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ কঠ ৯৮॥

বশী (সর্ব্বনিয়ন্তা) এক, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর স্থিত আত্মা। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে নিজেকে সৃষ্ট করিয়াছেন। সেই পরমাত্মাকে যে সব ধীর ব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যে দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অন্যের নহে।

১২। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতা ধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬-১১॥

তিনি একমাত্র দেবতা, যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে গোপনে অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সকল কর্ম্মের নিয়ামক, সমস্ত সৃষ্টি তাঁহাতে অবস্থিত, তিনি সাক্ষীস্বরূপ, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কেবল (সাথীহীন), তিনি নির্গুণ।

উপনিষদই হিন্দু ধর্ম্মের মূল। এই উপনিষদের বিজ্ঞানবাদ ব্যাখ্যায়ই বৌদ্ধবাদ প্রতিষ্ঠিত। গীতা এই উপনিষদেরই শক্তিবাদ ব্যাখ্যা। আমাদের দেশের বৈষ্ণবচিন্তাতে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার মধ্যে উপনিষদের ভাববাদের পরিকল্পনা বেশ স্পষ্টভাবে স্থান পাইয়াছে। এই উপনিষদ এর আসল সংগ্রহ গীতার যদি শক্তিবাদ টিপ্পনী আমরা করিতে পারি তবে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দুর্ব্বলতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদের শক্তিবাদ পরিকল্পনাকে অর্থাৎ 'গীতা'কে ব্রহ্মণ্যবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের উপনিষদের টিপ্পনীও ব্রহ্মণ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাববাদী মহাত্মারা উপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রধান শক্তিবাদ মূলক গ্রন্থটীকে অর্থাৎ গীতাকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ভাববাদ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। গীতা ও উপনিষদের টিপ্পনী লিখিবার পূর্ব্বে বেদের সংহিতা ভাগ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব কথা প্রকাশ করা হইল উহা দ্বারা তোমরা জীবনকে জ্ঞানময় ও কর্ম্মময় করিবার সব রকম বিজ্ঞানই বুঝিতে পারিবে। কিরূপ মহান আমাদের ধর্ম্ম, কিরূপ মহান আমাদের সমাজ, কিরূপ মহান আমাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ, কিরূপ মহান আমাদের জন্মভূমির প্রত্যেকটী অণুপরমাণু!! ভাব, এবং মহান ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া জীবনকে ধন্য কর। মহান ধর্ম্মের বিজয় ডঙ্কা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাজাইয়া মূর্খতা, বর্ব্বরতা, ও আসুরিকতার উচ্ছেদ কর। মানুষের জীবনের আনন্দ ফিরাইয়া আন।

ধর্ম্মগ্রন্থ

যদি কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কি? তোমরা অত্যন্ত উচ্চ শিরে জবাব দিবে 'বেদ'। এই বেদ সম্বন্ধে তোমাদের সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আত্মার আশ্রয়ে 'জ্ঞান' সদাকাল বিদ্যমান। এই 'জ্ঞান' বেদ। যেমন একখানা কাপড় প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট বুদ্ধিশক্তি বা জ্ঞানের প্রয়োজন, ঠিক সেইরূপ অন্তঃকরণে ও সমাজজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ও অলৌকিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যত প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন 'বেদ' সেই সব জ্ঞানের সমষ্টি। ঋষিগণ আত্মধ্যান দ্বারা এবং গবেষণা দ্বারা সমস্ত প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহারই নাম তপস্যা। তাঁহাদের সেই সব জ্ঞানরাশি মন্ত্রের আকারে বেদ রূপে বিদ্যমান। যাঁহারা এই চিরসত্য জ্ঞানকে জানেন তাঁহাদিগকে ঋষি বলা হয়। বেদ সবই মন্ত্র আকারে সংগৃহীত। এই পৃথিবীর মধ্যে

কেবল মাত্র আমরাই বেদের অধিকারী বলিয়া গর্ব্বিত। এবং আমরাই মাত্র উন্নত শিরে বলিতে পারি ঋষি আমাদের আদি পিতা। বেদের সব শাখা এখন পাওয়া যায় না। যতটা পাওয়া যায় উহার সংগ্রহও প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

বেদ, অনুভূতি ও জ্ঞান একই কথা। বেদের অন্য নাম 'শ্রুতি'। একযুগে ঋষিগণ এই সত্য তপস্যা দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার নাম বেদ। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে গুরু বা আচার্য্যের নিকট এই জ্ঞান শ্রবণ করিয়া আয়ত্ত করা হইত বলিয়া বেদের অন্য নাম "শ্রুতি"।

বেদের চার ভাগ আছে। যথা - ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ব। গান, পদ্য ও গদ্য, তিন প্রকারে মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের এক নাম 'ত্রয়ী'।

বেদকে ভিত্তি করিয়া শাস্ত্র (শাসন বিজ্ঞান) প্রস্তুত হইলে উহার নাম হয় 'স্মৃতি'। দর্শন শাস্ত্রগুলি এবং সমাজ ব্যবস্থামূলক গ্রন্থগুলি সবই স্মৃতি নামে খ্যাত।

প্রত্যেক বেদের তিনটি ভাগ আছে। যথা - সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। স্তুতিপ্রধান মন্ত্র রাশিই সংহিতা। সংহিতায় স্তুতি কথার মধ্যে সব রকম জ্ঞান নিহিত আছে। আমাদের সব প্রকার কর্ত্তব্য এই সব মন্ত্রে পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ' ভাগে যজ্ঞাদির বিধান ও সংহিতা ভাগের ব্যাখ্যা আছে। 'উপনিষদ' ভাগে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক আশ্চর্য্য অনুভূতিগুলির সংগ্রহ আছে। সংহিতা ভাগেও কিছু কিছু উপনিষদ পাওয়া যায়। আবার ব্রাহ্মণ ভাগেও উপনিষদ কিছু কিছু বিদ্যমান। অনেকে বলিতে চান যে উপনিষদ সংহিতা ভাগ হইতে কিছুটা আধুনিক। আমরা ইহা স্বীকার করি না। কারণ সংহিতা ভাগেও উপনিষদ রহিয়াছে। ইহা সত্যকথা যে বর্ত্তমান সময় যে সব উপনিষদ পাওয়া যায় উহাদের অনেকগুলি উপনিষদ আধুনিক। এইসব উপনিষদের সত্য ও সংহিতা ভাগে প্রাপ্য উপনিষদের সত্যও একই রূপ; কাজেই উপনিষদ ও সংহিতা একই যুগের জ্ঞান। নানাপ্রকার উপধর্ম্ম ও শাখা ধর্ম্মকে বেদের শাখা দেখাইয়া পৌরোহিত্যবাদটী কায়েম রাখিবার জন্যও অনেক উপনিষদ রচিত। সংহিতার মত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের অনেক শাখাই অপ্রাপ্য।

বেদকে বুঝিবার জন্য ষড়ঙ্গ বেদ পড়িতে হয়। ইহাদের নাম, যথা-

১। **শিক্ষা**। অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থকে শিক্ষা গ্রন্থ বলে। যাজ্ঞ বল্ক্য, পাণিনি, কাত্যায়নী প্রভৃতি মহর্ষিগণের শিক্ষা গ্রন্থ আছে।

২। **নিরুক্ত**। বৈদিক শব্দ সমূহের পরিভাষার নাম বৈদিক কোষ। মহর্ষি যাস্কের কোষ পাওয়া যায়। ইহাই পৃথিবীর প্রথম অভিধান।

৩। **কল্প**। যজ্ঞাদির ব্যবস্থা, ঔষধাদির বিধান। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কল্প আছে।

৪। **ছন্দ**। বৈদিক মন্ত্র সমূহের উচ্চারণ বিজ্ঞান। ইহা অনেকটা পদ্য বিষয়ক।

৫। **ব্যাকরণ**। বৈদিক ভাষার বিজ্ঞান। মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণ আছে।

৬। **জ্যোতিষ**। গ্রহ, লক্ষণ, পৃথিবী ও রাশিদের গতি স্থিতি সম্বন্ধীয় নিখুঁত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। বেদকে ভিত্তি করিয়া যাহাতে কেহ ভাববাদিতার প্রশ্রয় না দেয় এই জন্য এই সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বেদ পড়িবার নিয়ম। অনেক মূর্খ বেদের অঙ্গ জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া পৃথিবীর ও গ্রহ নক্ষত্রের স্থিতি ও অবস্থান সম্বন্ধে পুরাণ কল্পিত রূপ কথাকে আর্য্য জ্ঞান বলিয়া প্রচার করিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীকে কচ্ছপের উপর স্থাপনা এবং রাহু দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস ইত্যাদি পুরাণ-কথাকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহাদির গতির আবিষ্কার আধুনিক পণ্ডিতগণ করিয়াছেন বলিয়া বলিতে চান। তোমরা জ্যোতিষ পড়িলে দেখিতে পাইবে সেই অতীত বৈদিক যুগেই পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতিষ উহারই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

উপবেদ। বেদজ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধীয় বেদ আছে। উহাদিগকে উপবেদ বলে। অনেক উপবেদ আছে। তাহার চারখানা প্রধান। যথা -

সামবেদের উপবেদ - গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত বিষয়ক)।

যজুর্ব্বেদের উপবেদ - ধনুর্ব্বেদ (অস্ত্র, শস্ত্র ও রণবিদ্যা বিষয়ক)।

ঋগ্বেদের উপবেদ - আয়ুর্ব্বেদ (শরীর তত্ত্ব ও চিকিৎসা বিষয়ক)।

অথর্ব্ব বেদের উপবেদ - অর্থবেদ (রাজনীতি, কূটনীতি, সর্ব্বপ্রকার জড়বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞান বিষয়ক)।

স্মৃতি। মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ প্রভৃতি মহর্ষিদের স্মৃতি আছে। দর্শনশাস্ত্রগুলিও স্মৃতি নামে খ্যাত।

পুরাণ। ১৮ খানা পুরাণ শ্রেষ্ঠ। যথা ব্রাহ্ম, পাদ্য, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গাড়ুর, ব্রহ্মাণ্ড। ইহা ভিন্নও অন্যান্য উপপুরাণ আছে। পুরাণগুলিতে অনেক বৈদিক তত্ত্বের মীমাংসা আছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, যোগ, তন্ত্র শাস্ত্রাদিরও অনেক মীমাংসা আছে। অনেক কথার অর্থও বুঝা যায় না। অনেক পুরাণে যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত কথাও আছে। কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুরাণকে উপবেদ বলা হইয়াছে। পুরাণকে মন্বন্তরের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ জানিবে। সমস্ত পৃথিবীতে যে একযুগে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, পুরাণে উহার আভাষ পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত। ইহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কিছু কিছু কাব্যভাবও আছে। পুরাণের অনেক কথা ইহাতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতার সব কথাই রামায়ণ ও মূল মহাভারতে বিদ্যমান। তোমরা মূল রামায়ণ ও মূল মহাভারত পাঠ করিবে বা উহাদের ব্যাখ্যা পড়িবে। মহাভারত আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও কথাগুলি অতীব সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ। এদিকে ভাগবতের পাঠ সমাজে বেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। তোমরা মহাভারতের আলোচনা বৃদ্ধি করিবে।

তন্ত্র শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল। কপিল বঙ্গদেশে সাগর সঙ্গমে অবস্থান করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকারের চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার একটা ধারাতে অত্যন্ত উচ্চস্তরের দার্শনিকতা ও যোগবিদ্যার কথা আছে। সৃষ্টির শক্তিস্তরের সমস্তপ্রকার যোগবিদ্যা একমাত্র তন্ত্রেই আছে। তন্ত্রের একটা দিক আছে যাহাতে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন ও রোগাদির শান্তি করণের বিধান আছে। অনেকে তন্ত্রের এই অংশকেই তন্ত্র বলিয়া জানে। তন্ত্রের আরও একটা দিক আছে, উহা শিবস্তরের যোগবিদ্যায় পরিপূর্ণ। সব তন্ত্রই আনুষ্ঠানিক বিদ্যার অন্তর্গত। গুরু ভিন্ন ইহাতে প্রবেশ অসম্ভব। কোন কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে (বেদ) তন্ত্রকে উপবেদ বলা হইয়াছে। বেদ যেমন লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের সব দিকের সব তথ্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ তন্ত্রও তেমনি লৌকিক ও অলৌকিক সব রকম জীবনের জন্য বিরাট চিন্তারাশি। সমাজ, রাজনীতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, শরীরতত্ত্ব, রসায়ন, সঙ্গীত; যেদিকে তাকাও দেখিতে পাইবে তন্ত্র বেদের জ্ঞানকে সমুন্নত শিখরে স্থান দিতেছে। অনেক স্থানের চিন্তা এতই গভীর, মনে হয়, বেদের মতই ইহা একটী মৌলিক চিন্তাধারা এবং বেদের মতই ইহার চিন্তা প্রাচীন; যদিও ইহার ভাষা বেদ হইতে আধুনিক। ইতিপূর্ব্বে শিব মূর্ত্তির কথা বলিয়াছি। এই মূর্ত্তি তন্ত্রের দান। সব রকম মূর্ত্তিই তন্ত্রের দান। তোমরা যদি "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্র পাঠ কর তবে তন্ত্রের মোটামুটী সব জ্ঞান লাভ হইবে। খুব ছোট তন্ত্রের মধ্যে জ্ঞান সংকলনী তন্ত্র ভাল বই। বঙ্গদেশীয় পূজাবিধানে তান্ত্রিক যোগবিদ্যা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, তীব্বত, চীন, আফগানিস্থান, পারশ্য প্রভৃতি দেশে তন্ত্রের প্রচলন খুব বেশী। ইহাদের মধ্যে বঙ্গ, নেপাল ও মহারাষ্ট্র তন্ত্রবিদ্যার জন্য খুব প্রসিদ্ধ। একযুগে সমস্ত এশিয়া খণ্ডে ও আফ্রিকায় তান্ত্রিক জ্ঞান প্রচলিত ছিল।

যোগশাস্ত্র। ইহা তন্ত্র বিদ্যারই শাখা। শক্তিস্তরের যোগবিদ্যা তন্ত্র ভিন্ন কোথাও নাই। শিবস্তরের যোগবিদ্যা যোগশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহাকে 'অষ্টাঙ্গ যোগ' বলে। হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক ভাগের নাম যোগশাস্ত্র। যোগ বিদ্যার আসল লক্ষ্য মনকে ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে বিকশিত করিতে সাহায্য করা।

যোগদর্শন আলোচনা করিলে মনের নিম্ন ও উচ্চতম স্থিতির সব কথাই জানা যায়। শিব সংহিতা, অষ্টাবক্র সংহিতা যোগ সম্বন্ধে ছোটর মধ্যে ভাল বই।

রুদ্রী। সংহিতা (বেদ) ভাগের সার কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে বেদজ্ঞানের সব কথাই ছোট আকারে বিদ্যমান। এই রুদ্রী পাঠ করিয়া বিশ্বনাথের আরতি হইয়া থাকে। ইহাতে মাত্র আটটী ছোট ছোট অধ্যায় আছে। বেদের কর্ম্মধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম ও জ্ঞান ধর্ম্মের সারভাগ রুদ্রীতে বিদ্যমান। ইহার একটি অধ্যায় অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ক। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়টি পুরুষসূক্ত। সুবিধা হইলে ইহা তোমরা আয়ত্ত করিবে, ইহা বিশ্বরূপ স্তুতি।

গীতা। দ্বাপর যুগের বিপ্লব গ্রন্থ মহাভারতের অংশ। ইহাতে বেদের কর্ম্ম বিজ্ঞান, উপাসনা বিজ্ঞান ও জ্ঞান ধর্ম্মের (উপনিষদের) সব কথাই বিদ্যমান। অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া যে দার্শনিকতা, যোগ ও মনোবিজ্ঞান হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি উহার আলোচনা ইহাতে হইয়াছে। উহা বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে এখনই ধর্ম্মানুশীলনে মন দিতে হইবে। যত বয়স বৃদ্ধি হইবে ততই নূতন নূতন চমৎকারিতা গীতায় দেখিতে পাইবে। ইহা দর্শনশাস্ত্রের সার। গীতার শক্তিবাদী ব্যাখ্যা না থাকায় আমাদের সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

চণ্ডী। ইহা সত্য যুগের সমাজ বিপ্লবের কাহিনী। এই সমাজ বিপ্লবের কাহিনী ও মনোবিকাশের স্তরগুলি একই বিজ্ঞানে স্থান পাইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। আত্মাকে বা মহাশক্তিকে মা বলিয়া উপাসনা করিবার রহস্য এবং সমাজজীবনে একই মহাশক্তিকে 'মা' বলিয়া মানিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার বিজ্ঞান ও শক্তিশালী হইবার কথা ইহাতে সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছে। চণ্ডী সমস্ত তন্ত্র বিদ্যার সার। আসুরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে রুদ্রী, গীতা ও চণ্ডী একই নীতির সমর্থক। গায়ত্রী উপাসনা এই চণ্ডীরই উপাসনা জানিবে। চণ্ডী ভক্তিবাদ প্রধান 'শক্তিবাদ' গ্রন্থ। ইহা রাজনীতি, সমাজনীতি ও দার্শনিক বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। বেদ ভিন্ন অন্য যত সব ধর্ম্ম গ্রন্থের কথা বলা হইল ইহা বেদের শাখা জানিবে। চণ্ডীর মধ্যে দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ শক্তির ৪টি স্তুতি আছে। উহার মধ্যে একটি বা দুইটি তোমরা আয়ত্ত করিয়া রাখিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম

স্বাস্থ্যধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। ইহাকে কর্ম্ম ধর্ম্মের অন্তর্গত জানিবে। মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে প্রাণকেন্দ্র আছে। বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম দ্বারা এই প্রাণকেন্দ্র সতেজ থাকে। ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে মস্তিষ্কের আরও সব কেন্দ্রগুলির কথা বলিয়াছি। সংক্ষেপে সেইগুলির পরিচয় চিত্রে দেখ এবং কেন্দ্রগুলি চিনিয়া লও। ৯ = প্রাণকেন্দ্র। ১ = কর্ম্মকেন্দ্র। বা ব্রহ্মা। বা মন। ২ = সূর্য্যকেন্দ্র। ইহাই স্মৃতির কেন্দ্র। স্বপ্নস্তর। ৩ = বিষ্ণুকেন্দ্র। ইহার অন্য নাম সুখকেন্দ্র, নিদ্রাস্তর। ইহাও স্মৃতির কেন্দ্র। সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরের স্মৃতি এক রকম নহে (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য) ৪। শিবকেন্দ্র = ইহাই ধর্ম্মকেন্দ্র। সুষুপ্তি স্তর। ৫ = জ্ঞানকেন্দ্র। ৬ = অব্যক্ত কেন্দ্র। কর্তৃত্বকেন্দ্র। ৭ = গণেশকেন্দ্র বা বিবেক, বিচার কেন্দ্র। ১০ = ইহা একটি রেখা। ইহার নাম শক্তিরেখা। তোমরা যদি একটু চিন্তা করিয়া পর্য্যালোচনা কর তবে বুঝিতে পারিবে, সবগুলি কেন্দ্রের ঠিক সতেজ অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের জীবন সুখময় এবং আনন্দময় হয়। ইহাদের মধ্যে ঐ প্রাণকেন্দ্রটি সতেজ রাখিবার বিজ্ঞানমাত্রই এই স্বাস্থ্যধর্ম্ম অংশে বলা হইবে। আমাদের যোগ শাস্ত্রে হঠযোগ নামক যোগাঙ্গের সবই স্বাস্থ্যধর্ম্ম মূলক।

সব জাতিরই চিন্তা ও বিজ্ঞান ধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের সব রকম চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর সব দেশ এবং জাতির চিন্তাধারা অপেক্ষা একটু অন্য রকমের। আমরা মেরুদণ্ড ও উহার মধ্যস্থিত নাড়ীমণ্ডলীকে

কেন্দ্র করিয়া শরীর, মন, বিবেক, প্রেম, সুখ, শান্তি, ধর্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া থাকি। অন্যান্য দেশ মানবজীবনের এই সত্য সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ। আমাদের জীবনসত্যের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার মধ্য যুগের অপক্বজ্ঞানীদের অদূরদর্শিতায় আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে, যাহার জন্য আমরা আজ পরাধীন। আমাদিগকে আবার সেই শক্তিকে, আমাদের ঠিক ঠিক দৃষ্টভঙ্গীকে উদ্ধার করিতে হইবে। অন্যান্য দেশের ব্যায়াম পেশীগুলিকে শক্ত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের ব্যায়াম ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবার দরুণ সেই ব্যায়াম ধারা জীবনীশক্তির মূল আধার মেরুদণ্ডকে কার্য্যক্ষম রাখিবার দিকে নজর রাখিয়া করা হয়। এইরূপ উভয় প্রকার ধারায় ব্যায়াম করিবার ফলও দুই প্রকারের হয়। যাহারা মেরুদণ্ডের সম্বন্ধহীন ব্যায়াম করে তাহারা জীবনের এক সময় বাতগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। আমরা এখানে যে ক'টী ব্যায়ামের কথা বলিব সেইগুলি বালক বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলের জন্য সমান ভাবে উপযোগী। কাজেই সকলকে এই ব্যায়াম অভ্যাস করিতে উৎসাহ দান করিবে এবং নিজেরাও করিবে।

প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক পল্লীতে বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ সকলে একটা পবিত্রস্থানে সূর্য্যাস্ত কালে একত্রিত হইবে এবং সমবেত ভাবে ব্যায়াম অনুষ্ঠান করিয়া বাড়ীতে ফিরিবে। বর্ত্তমান সময় এদেশে পশ্চিমী খেলা ও ব্যায়াম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার উভয়টীই আমাদের মত গরীব জাতির জন্য অনুপযুক্ত। ঐসব খেলার জন্য বহু অর্থ ও বিরাট মাঠের প্রয়োজন হয় এবং উহাতে মাত্র ২২ জন লোক খেলা করিতে পারে। ঐসব খেলা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। তোমরা কোন মন্দিরের প্রাঙ্গণে বা কোন পবিত্র খোলা স্থানে ব্যায়ামের জন্য সমবেত হইবে। বালিকা ও নারীগণ বাড়ীর মধ্যে একত্রিত ভাবে বা স্বতন্ত্র ভাবেই ব্যায়াম সম্পন্ন করিবে। নর নারীরা একস্থানে ব্যায়াম করিবে না। (যাহারা পেশীর জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে চায় তাহারা উহাও করিতে পারিবে)।

যাহারা পেট ভরিয়া নুন ভাত এবং নুন রুটী আহার করিতে পারে তাহারাও এই ব্যায়াম দ্বারা উপকৃত হইবে। আমরা এমন কয়েকটী বাছা বাছা সরল ব্যায়াম এখানে প্রবর্ত্তন করিলাম যাহা গরীব, ধনী, শিশু, বৃদ্ধ ও নর নারীর জন্য সমান ভাবে উপকারী।

সমবেত ভাবে ব্যায়াম করিবার জন্য কতগুলি নিয়মানুবর্ত্তিতার অভ্যাস করিতে হয়। এজন্য কতকগুলি আদেশ লেখা হইল। ঐ গুলি একজন নির্দ্দেশকের অধীন হইয়া আয়ত্ত করিবে এবং নির্দ্দেশকের অধীন হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। প্রথম আমরা আদেশগুলির কথা বলিতেছি।

১। আরামে। Stand at ease. দুই পা ফাঁক (৩০") করিয়া দাঁড়াও। হাত পেছনে বাঁধা থাকিবে। এই আদেশ দিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। এই আদেশ শুনিবা মাত্র যে যেখানে আছে সেই খানেই ঐ ভাবে দাঁড়াইবে এবং বাম পায়ে ভর দিবে।

২। সম্যক্। **(**form single ring**)**। একের পেছনে অন্যে দাঁড়াইবে। দাঁড়াইবার সময় দুই হাতের বেশী স্থান মাঝখানে থাকা চাই।

৩। পুরস্ যোজয়। আগের সঙ্গে মিল। অর্থাৎ যদি দুইজনের মধ্যে দুই হাতের বেশী স্থান থাকে সেটা কম করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই হাত ফাঁক মাত্র রাখিয়া দাঁড়াইবে। এবং ডানে বামে তাকাইয়া লাইন সোজা করিয়া দাঁড়াইবে।

৪। স্বস্থয়। সুখে দাঁড়াও। বাম পা যথা স্থানে ফাঁক করিয়া রাখিবে। এই আদেশে এদিক ও দিক তাকানো যায় এবং হাত নাড়া যায়। কথাও বলা যায়।

৫। দক্ষয়। (alert) সোজা হইয়া দাঁড়াও, দুই পা একত্র কর, নজর শত গজ সম্মুখে রাখ, দুই হাত ঊরু স্থানে রাখ, অঙ্গুলিগুলি পরস্পর লাগিয়া থাকিবে।

৬। সিদ্ধয়! প্রস্তুত হও। ইহা 'দক্ষয়' এর সমকক্ষ। দক্ষয় অবস্থায় থাকিয়া বাম পদে ভর দিবে।

৭। সাবধান। আদেশের জন্য প্রস্তুত হও। যদি উন্মনস্ক দেখা যায় তবে এই আদেশ দিবে। এই আদেশ পাইলে বাম পদে ভর দিবে এবং সম্মুখের দিকে সতেজ হইয়া তাকাইবে।

৮। প্রচল। আগে চল। forward.

৯। বেগ চল। দৌড়াও।

১০। দক্ষিণ। ডান পা ফেল।

১১। বাম। বাম পদ ফেল।

১২। এক পদ প্রস্‌সর। এক পা অগ্রবর্ত্তী হও। (আগে বাম পা ফেলিও, যুদ্ধপন্থা আমাদের ধর্ম্ম মতে বাম মার্গী পন্থা)।

১৩। দ্বিপদ প্রস্‌সর। দুই পা অগ্রবর্ত্তী হও।

১৪। ত্রিপদ প্রস্‌সর। তিন পা অগ্রবর্ত্তী হও।

১৫। চতুর পদ প্রস্‌সর। চার পা অগ্রবর্ত্তী হও।

১৬। উপবেশয়। বস।

১৭। উত্তিষ্ঠয়। দাঁড়াও।

১৮। মণ্ডলয়। গোলাকারে দাঁড়াও। ঘেরিয়া ফেল।

১৯। গণ বিভাগ। এক দুই, এক দুই, বল। number in twos. লাইনের বাম দিকে প্রথম ব্যক্তি দুই বলিবে। এই ভাবে গণিয়া চলিবে।

২০। দ্বিততী। দুই ভাগ হইয়া যাও। এক নম্বর দুই পা আগে আসিবে।

২১। অংশ ভাগ। এক, দুই, তিন; এক দুই তিন বল। number in threes.

২২। ত্রিততী। তিন ভাগ হইয়া যাও। ১নং দুই পা আগে, ২নং স্বস্থানে, এবং তিন নম্বর দুই পা পেছনে।

২৩। গণ ভাগ। এক, দুই, তিন, চার; এক দুই তিন চার বল; number in fours.

২৪। চতুরততী। চার ভাগ হইয়া যাও। ১নং চার পা আগে, ২নং স্বস্থানে, ৩নং দুই পা আগে এবং ৪নং দুই পা পেছনে।

২৫। বাম দৃগ্‌। eyes left. বাম দিকে তাকাইয়া লাইন সোজা কর।

২৬। দক্ষিণ দৃগ্‌। eyes right. ডান দিকে তাকাইয়া লাইন সোজা কর।

২৭। স্তব্ধয়। থাম।

২৮। ভঙ্গছত্রং। ছিত্‌রাইয়া যাও।

২৯। সমক্ষম্‌। সামনা সামনি দাঁড়াও। এই আদেশ দুইটা সারিতে দণ্ডায়মানগণকে মুখামুখী করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৩০। বিপরীতম্‌। বিপরীত মুখী দাঁড়াও। এই আদেশ দুইটা সারিতে দণ্ডায়মানগণকে পরস্পরের বিপরীত মুখী করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৩১। অগ্রানুতিষ্ঠ। আগের লাইনের সঙ্গে সমানে দাঁড়াও। দ্বিততী প্রভৃতি বিভাগ হইবার পর লাইনের ধার সোজা করিবার জন্য এই আদেশ প্রয়োজন হয়।

সমবেত ভাবে অধ্যাত্ম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার জন্য আরও কয়েকটী আদেশ প্রয়োজন হইবে। যথা -

৩২। অধ্যাত্ম ধর্ম্মানুষ্ঠানে সিদ্ধয়। এই আদেশ পাইলে ব্রহ্মনাড়ীতে মন দিবে।

৩৩। স্বস্তিকাসনে উপবেশয়। বসিবার আসন না থাকিলে এই আদেশ দিবে না। (বা পদ্মাসনে উপবেশয়)। বসিবার আসনের ব্যবস্থা না থাকিলে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে।

৩৪। (ক) পূর্ব্বাভিমুখং ভব॥ (খ) উত্তরাভিমুখং ভব॥ (গ) ঈশানাভিমুখং ভব॥ পূর্ব্ব। উত্তর। ঈশানাভিমুখ হও।

৩৫। মূলাধারে কুণ্ডলিনী নামক মহাশক্তিং ধ্যায়েৎ॥

৩৬। সহস্রারে (শিব পিণ্ডে) পরম ব্রহ্মন্ ধ্যায়েৎ॥ শিবপিণ্ডে পরম ব্রহ্ম ধ্যান কর।

৩৭। মূলাধারাৎ সহস্রার পর্য্যন্তব্যাপ্তং ব্রহ্মনাড়ীং ধ্যাত্বা ত্রিধা গায়ত্রীং তথা ব্রহ্ম স্তোত্রং গায়েৎ।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১)* **-** দক্ষয়॥ ১ – পায়ের অঙ্গুষ্ঠ একত্র কর। হাত সামনের দিকে দিয়া মাথার উপর তোল। বাহুমূল কর্ণ সংযুক্ত থাকিবে। এইভাবে তিন সেকেণ্ড থাক।

২ – সামনের দিকে ঝুকিয়া হাতের অঙ্গুলী পায়ের অঙ্গুলীর সঙ্গে লাগাও। দৃষ্টি হাটুর দিকে রাখ। এইভাবে তিন সেকেণ্ড থাক। (১-২ আদেশ ৬টী হইতে ৮টী দিতে পারিবে)।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (২) – দক্ষয়॥ ১ – পায়ের অঙ্গুষ্ঠ মিলাও। হাত দুইটা কাঁধের সোজা উপরে দুই পার্শ্বে তোল। হাতের অঙ্গুলি সব খোলা ও সোজা থাকিবে। এই ভাবে ৩ হইতে ৫ সেকেণ্ড অবস্থান কর।

২ - হাত দুইটী ধীরে ধীরে সামনের দিকে আন ও সোজা আনিয়া কর দুইটী মেলাও। এইরূপ ১-২ আদেশ ৬টী দিবে। ১২টীর বেশী দিবার প্রয়োজন হইবে না।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৩) – দক্ষয়॥ ১ - হাত দুইটী দুই পাশ দিয়া মাথার উপরে তোল, দুই হাতের তলা মিলাও। হাত দুইটী ঠিক কাণের সোজা উপরের দিকে তুলিবে।

২ – ঐ ভাবে বাম পার্শ্ব মোড়। যেন পা উঠে না।

১ – এবার এক স্থিতিতে এস।

৩ – ঐ ভাবে দক্ষিণ পার্শ্বে মোড়। আদেশ - ১–২, ১–৩। এইরূপ আদেশ ৬টী দিবে। ১২টীর বেশী দিবে না।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৪)* - দক্ষয়॥ ১ – দুই পা লম্ফ দ্বারা ফাঁক কর, সেই সঙ্গে হাত দুইটি কাঁধের সোজা উপরে তোল।

২ – পা দুইটী লম্ফ দ্বারা একত্র কর এবং হাত দুইটী উরুতে মিলাও অর্থাৎ দক্ষয় স্থিতিতে এস। (১-২ আদেশ ২৫ হইতে ৪০টী দিবে)।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৫)* – বুকডন। ১ – বুক ডন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। অর্থাৎ দুই হাতের পাতায় ও দুই পায়ে ভর দিয়া সোজা মাটীর উপর অবস্থান কর।

২ – বাম পা পেটের দিকে মোড়, যেন মাটীতে না লাগে।

৩ – ডন দাও। অর্থাৎ বুক নামাও।

৪ – উঠ–। উঠিবার সময় বুকের দিক আগে উঠাইবে এবং কোমরের দিক পরে উঠাইবে।

১ – স্থিতিতে এসো।

২ – এবার ডান পা মুড়িবে।

৩ – ডন দাও অর্থাৎ বুক নামাও।

৪ – উঠ–। পূর্ব্ববৎ॥ আদেশ (১,২,৩,৪) ৬টী হইতে ৮টী দিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৬) – দক্ষয়॥ ১ – বাহুর পেশী কষিয়া হাতের মুষ্টি বাঁধ। মুষ্টি দুইটী বুকের সোজায় দুই পার্শ্বে থাকিবে। বাম পায়ে দাঁড়াও॥ ২০ পা এক পায়ে চলিবার পর পরিবর্ত্তয় অর্থাৎ ফিরিবে। এবার ২ – আদেশ দিলে ডান পায়ে দাঁড়াইয়া ২০ পা চলিবে। এই ভাবে ১-২ আদেশ ৪ হইতে ৮টি দিতে পারিবে। এই ব্যায়ামে লম্ফকালে সব সময় পায়ের সামনের দিকে ভর দিবে। গোড়ালীর দিকে ভর দিয়া লম্ফ দিলে আঁতে বা জরায়ুতে চোট লাগিতে পারে। বিশেষ করে মেয়েরা এই ব্যায়াম কালে খেয়াল রাখিবে যেন পায়ের সামনের দিকেই ভর পড়ে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৭) – পা মেলিয়া বস। ১ – মেরুদণ্ড সোজা কর। হাত দুইটী সামনের দিক দিয়া মাথার উপর তোল। অঙ্গুষ্ঠ দুইটি মিলাও। এভাবে তিন সেকেণ্ড থাক। ২ – মাথাসহ হাত ও বুক নামাইয়া হাতের অঙ্গুলী দ্বারা পায়ের অঙ্গুলী ধর। তিন সেকেণ্ড থাক। এই আদেশ ১-২, ৬টি হইতে ৮টি দিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৮) – (৭) নং অনুষ্ঠান বিধিতে পা মেলিয়া বস।

(১) - (৭) নং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের '১' আদেশের নিয়মে হাত উপরে তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠ বাঁধ এবং মেরুদণ্ড সোজা কর। এই ভাবে তিন সেকেণ্ড থাক।

২ – ঐ ভাবে বাম দিকে মোড় ও তিন সেকেণ্ড থাক। ১ – আবার স্থিতিতে এস। তিন সেকেণ্ড থাক। ৩ – এবার ডান দিকে মোড়। তিন সেকেণ্ড থাক। আদেশ ১-২, ১-৩। ৬টি আদেশ দিতে পারিবে। ১২টির বেশী দিবে না।

এবার কয়েকটি স্বাস্থ্যধর্ম্মবিধি শয়ন অবস্থায় অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম বলা যাইতেছে। এসব বিধান সমবেত ভাবে করিবার প্রয়োজন নাই। এইগুলি করিতে হইলে বিছানা বা চৌকি অথবা পাকা মেঝের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই সব শয়ন ব্যায়ামগুলি অত্যন্ত উপকারী এবং নর ও নারীদের জন্য অত্যন্ত হিতকারী। শয়ন অবস্থায় ব্যায়াম করিবার সুবিধা না থাকিলে ১-৭ নং ব্যায়াম করিয়া ব্যায়াম শেষ করিবে এবং উপাসনার আদেশ দিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (৯) – পাটীমোড়া ব্যায়াম।

খুব টান টান হইয়া চিৎ হইয়া শয়ন কর। গোড়ালী দুইটি সংলগ্ন কর। হাত দুইটি কানের সোজায় মাথার উপর সংলগ্ন কর।

১ – এবার বামদিকে মোড়। সবটা শরীরের বোঝা বামপার্শ্বে চলিয়া আসিবে। বরং আরও একটু বেশী সামনের দিকে কাৎ হইবে।

২ – ঐরূপে ডান দিকে মোড়।

আদেশ:- ১-২। ১০টি হইতে পনরটী আদেশ দেওয়া যাইবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১০) – (৯) নং বিধানে টান টান হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি মুড়িয়া মাথার নিম্নে স্থাপন কর। এবং বাহুদ্বয় দ্বারা কপালের দুইদিক একটু চাপিয়া ধর। ১ – বামদিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০-১৫টি দিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১১) – ৯নং বিধানে টান টান হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি সোজা দুই উরুতে রাখ। ১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১২) – ৯নং বিধানে টান টান ভাবে উপুর হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটী মাথার উপর সোজা উঠাইয়া সংলগ্ন কর।

১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১৩) – ১২নং বিধানে উপুর হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটী সোজা করিয়া উরুতে সংলগ্ন কর। ১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে। নারীরা শাখা বা কাঁচের চুড়ি পরিয়া এই সব শোয়া ব্যায়াম করিলে চুড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১৪)* – ১৩নং বিধানে উপুর হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি পিঠের উপর রাখিয়া ডান হাতে বাম কবজী ধর। ১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১৫)* – ১৩নং বিধানে উপুর হইয়া শয়ন কর। পা দুইটি মুড়িয়া পিঠের দিকে আন। পদদ্বয় হস্তদ্বয় দ্বারা ধর।

১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম (১৬)* – শামুক ব্যায়াম। চিৎ হইয়া শয়ন কর। হাটু দুইটি মুড়িয়া বুকের দিকে আন। পায়ের ফাঁকে হাত দুইটি প্রবেশ করাইয়া ডান হাতে বাম হাতের কবজী ধর। এই ভাবে স্থিত হইয়া একবার মাথা তোল এবং কোমর ও পায়ের দিক নামাও। এবং অন্যবার কোমর ও পায়ের দিক তোল এবং মাথা নামাও। এই ঘুংগী খেলা ব্যায়াম ১৫ হইতে ২৫ বার করিতে পারিবে। এই ব্যায়াম কালে প্রয়োজন হইলে মাথার নীচে বালিস ব্যবহার করিবে। নয়তো মাথা ব্যথা হইতে পারে।

যদি অল্প সময়ে ব্যায়াম সম্পন্ন করিতে চাও তবে তারকা * চিহ্নিত ব্যায়ামগুলি মাত্র করিবে।

বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনার কথা

বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনা অর্থে বৈদিক সন্ধ্যোপাসনা বুঝিতে হইবে। আমরা সামবেদীয় উপাসনা বিধি এই পুস্তকে দিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ক্ষুদ্র পুস্তকে এই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপাসনার সব বিজ্ঞান ও যোগের ইঙ্গিত আলোচনা অসম্ভব। তাই আমাদের ইচ্ছা রহিল আমরা সেই সম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিব। যাহারা

বিস্তারিত সন্ধ্যোপাসনা করিতে ইচ্ছুক তাহারা যে কোন সন্ধ্যার বই দেখিয়া করিতে পারিবে। সর্ব্বত্র ঐরূপ পুস্তক অল্প মূল্যে প্রাপ্য।